বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন, তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুকুমার সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ : পৌষ ১৩৫০
সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

॥ জ্যেষ্ঠ-পিতামহী বড়মা-র স্মরণে ॥

এই বইয়ে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংসারিক জীবনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। উপযুক্ত উপাদানের অভাবে এই পরিচয় সর্বাঙ্গীণ নয়। তবে কল্পনার সাহায্যে অবান্তর ও অমূলক সম্পূর্ণতা দিয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত বা অতথ্যকে তথ্য প্রতিপন্ন করা হয় নি।

সূচী

বাংলা দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রথম আলোকরশ্মি পড়তে শুরু হয়েছে উত্তর-পশ্চিম থেকে আর্যদের আগমনের ও বসতিস্থাপনের পর হতে। তার পূর্বে এদেশে দ্রাবিড় মোঙ্গল কোল প্রভৃতি যে-সব অনার্য জাতির বাস ছিল তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইসারা পাই শুধু কতকগুলি স্থানের নামে এবং কয়েকটি চলিত শব্দে। কোন্ সময় থেকে বাংলা দেশে আর্যদের বসতি আরম্ভ হয় তা ঠিক করে বলা শক্ত, তবে মৌর্য-সম্রাট্দের শাসনকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দীতে যে অন্তত উত্তরবঙ্গে আর্যদের উপনিবেশ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ে যে একটি খণ্ডিত শিলাচক্র পাওয়া যায় তাতে অশোকলিপির সমসাময়িক অক্ষরে উৎকীর্ণ প্রাকৃত ভাষায় লিপি আছে। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এই সংক্ষিপ্ত প্রত্নলিপিটির অর্থ অনুমানের কোঠাতেই রয়ে গেছে। তবে এইটুকু বোঝা যায় যে পুণ্ড্রনগরের অর্থাৎ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন শহরের সাধারণ শস্যাগার থেকে দুর্ভিক্ষের সময়ে ধান সরষে ইত্যাদি শস্য ধার নেওয়া বিষয়ে স্থানীয় শাসনকর্তার অনুজ্ঞা এতে উৎকীর্ণ হয়েছিল। যুক্তপ্রদেশে গোরখপুর জেলায় সোহ্‌গৌরা গ্রামে যে অনুরূপ একটি প্রাচীন তাম্রপট্টলিপি পূর্বে পাওয়া গিয়েছিল তার থেকে মহাস্থানগড় লিপির মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়।

সমগ্র দেশ বোঝাতে 'বাঙ্গালা' এই নাম মোগলদের অধিকার-কালেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তার আগে সমগ্র বাংলা দেশ বোঝাতে 'গৌড়-বঙ্গ' বা 'গৌড়-বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার হ'ত। বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি 'বঙ্গপাল' থেকে বলে মনে হয়। বাংলা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চল সেকালে প্রধানত জলা জায়গা ছিল। এই জলা জায়গার সাধারণ নাম ছিল বঙ্গ। আর বঙ্গের অধিবাসীরা বঙ্গাল নামে খ্যাত ছিল অন্তত পক্ষে একাদশ শতাব্দী থেকে। প্রাচীনকালে আধুনিক বাংলা দেশ প্রধানত চার বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল—বরেন্দ্রী, সুহ্ম (বা রাঢ়া), বঙ্গ ও কামরূপ। গৌড় বলতে সাধারণ

রাঢ়-বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বাংলা আর বঙ্গ শব্দে বঙ্গ-কামরূপ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পুর্ব বাংলা বোঝাত। শাসনকার্যের জন্যে বাংলা দেশ তখন চার ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল—পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি, দণ্ডভুক্তি এবং প্রাগ্জ্যোতিষভুক্তি। পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে ছিল উত্তর ও পূর্ব বাংলা, বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল পশ্চিম বাংলা, দণ্ডভুক্তির অন্তঃপাতী ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা আর উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের সংলগ্ন অংশ, এবং প্রাগ্-জ্যোতিষভুক্তির মধ্যে ছিল কামরূপ বা উত্তর-পূর্ব বাংলা ও আসাম। সেন-রাজাদের আমলে উত্তর-পশ্চিম বাঙ্গালায় কঙ্কগ্রামভুক্তিরও উল্লেখ পাওয়া গেছে।

মৌর্য-যুগে বা তারও পূর্বে উত্তরবঙ্গে আর্য-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার ইতিহাসের সূত্রের খেই পাওয়া যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে। কেননা গুপ্ত-সম্রাট্দের শাসনকালে বাংলা দেশে আর্যভাষা-ভাষীদের উপনিবেশ ব্যাপকতর এবং প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে শাস্ত্রজ্ঞ ধার্মিক ব্রাহ্মণদের এনে ভূমিদান দিয়ে স্থিত করা হয়। এই সময়ের কতকগুলি প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে। তার থেকেই ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

দিগ্বিজয়ে বার হয়ে সমুদ্রগুপ্ত বাংলা দেশেও এসেছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে কালিদাস সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-কাহিনীরই ইঙ্গিত করেছেন। কালিদাসের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে তাঁর সময়ে বঙ্গের অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব নিম্ন অঞ্চলের নৌবাহিনী বিখ্যাত ছিল। "নৌসাধনোদ্যত" বাঙালীদের জয় করতে কালিদাসের কাব্যের নায়ক রঘুকে বেগ পেতে হয়েছিল। এবং সম্ভবত উপযুক্ত নৌবাহিনীর অভাবেই সুহ্মেরা এবং কামরূপের রাজা সহজে রঘুর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। পরবর্তী কালে পাল ও সেন-রাজাদের চতুরঙ্গ-বলের প্রধান অঙ্গ ছিল নৌবাহিনী।

সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র বাংলা দেশ জয় করলেও তা সম্পূর্ণভাবে শাসনে রাখতে পারেন নি। যতদূর জানা যায় তাতে অনুমান হয় যে শুধু উত্তরবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ

গুপ্ত-সম্রাট্দের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বোধ হয় তখনও স্বাধীন ছিল, অন্তত অংশত। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের এক স্বাধীন রাজার পরিচয় পাওয়া গেছে। ইনি ছিলেন পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র, "চক্রস্বামী"-র অর্থাৎ বিষ্ণুর দাসশ্রেষ্ঠ চন্দ্রবর্মা। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে এঁর লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। চন্দ্রবর্মার রাজধানী ছিল পুষ্করণা নগরী, বোধ হয় বর্তমানে দামোদরের দক্ষিণ তীরে পোখরনা গ্রাম। বাংলা দেশের প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসে সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মা প্রথম স্বাধীন রাজা।

২

গুপ্ত-সম্রাটদের কর্মচারীদের ও স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের দেওয়া তাম্রপট্টলিপি যা পাওয়া গেছে তা সবই উত্তরবঙ্গে রাজশাহী-দিনাজপুর-বগুড়া জেলায়। এর থেকে মনে হয় বাংলা দেশের এই অংশ গুপ্ত-সম্রাটদের সাক্ষাৎ অধিকারে ছিল। অবশ্য পরে অন্যস্থান থেকে প্রত্নলিপি বার হলে এ সিদ্ধান্ত উল্‌টে যেতে পারে। এই প্রত্নলিপিগুলি থেকে সেকালের শাসন-ব্যবস্থার মোটামুটি কাঠামো জানা যায়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে জনসাধারণের অনেকখানিই কর্তৃত্ব ছিল তাও জানতে পারি। শাসনকার্যের জন্য তখন দেশ ভাগ করা ছিল প্রথমত ভুক্তিতে অর্থাৎ প্রদেশে। ভুক্তি আবার কতকগুলি "বিষয়"-এ অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত ছিল। বিষয় গঠিত হত কতকগুলি "বীথী" কিম্বা "মণ্ডল" অর্থাৎ মহকুমা নিয়ে। বীথীর মধ্যে ছিল কয়েকটি "চতুরক" বা চৌকী।

ভুক্তির প্রধান রাজকর্মচারীর পদের নাম ছিল "উপরিক"। ইনি ছিলেন প্রতিরাজ বা রাজপ্রতিনিধি। কখনো বা রাজধানী পাটলীপুত্র থেকে উপরিক নিযুক্ত হয়ে আসতেন, কখনো বা প্রভাবশালী কোনো স্থানীয় ব্যক্তি উপরিক নির্বাচিত হতেন। কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে প্রদত্ত দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উপরিকের নাম পাই চিরাতদত্ত। এঁর কোনো পদিক-উপাধি নেই, তাই মনে হয় যে ইনি ছিলেন স্থানীয় লোক। চিরাতদত্তের

অধীনে এক বিষয়পতি ছিলেন বেত্রবর্মা। এঁর উপাধি ছিল "কুমারামাত্য"। অর্থাৎ ইনি রাজসভায় রাজপুত্র-শ্রেণীর সম্মানের অধিকারী ছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে ইনি স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না, পাটলীপুত্র হ'তে নিয়োগপত্র নিয়ে ইনি এসেছিলেন। স্কন্দগুপ্তের পর থেকে গুপ্ত-সম্রাটদের শাসনরশ্মি ক্রমশ শিথিল হয়ে আসায় প্রত্যন্ত প্রদেশের উপরিকেরা কতকটা স্বাধীন হয়ে "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বুধগুপ্তের সময়ে প্রদত্ত দামোদরপুর শাসন দুটিতে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উপরিক ছিলেন মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও মহারাজ জয়দত্ত। কখনো কখনো উপরিকেরা "মহাসামন্ত" উপাধিও ধারণ করতেন। সেন-রাজাদের আমলে এঁরা "প্রতিরাজ" নামেও পরিচিত ছিলেন।

জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাহায্যে উপরিক ভুক্তির আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য চালাতেন। প্রতিনিধিমণ্ডলীর বা শাসন-পরিষদের নাম ছিল "অধিষ্ঠানাধিকরণ"। এর সভ্য ছিল চার জন—"নগর-শ্রেষ্ঠী" অর্থাৎ ব্যাঙ্কার বা শেঠদের প্রতিনিধি, "প্রথম-সার্থবাহ" অর্থাৎ বণিক্-সমাজের প্রতিনিধি, "প্রথম-কুলিক" অর্থাৎ উৎপাদক-শিল্পীদের প্রতিনিধি, আর "প্রথম-কায়স্থ" বা "জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ অর্থাৎ রাষ্ট্র-দফতরের চীফ সেক্রেটারী। গুপ্ত-যুগের শেষের দিকের তাম্রপট্টলিপিতে অধিষ্ঠানাধিকরণের সভ্যদের নামের উল্লেখ নেই। তার কারণ উপরিক তখন স্বাধীন শাসক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জনসাধারণের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর মতামতের মূল্য কমে গিয়েছিল বলে। তাম্রপট্টলিপিগুলি থেকে জানা যায় যে দেবতার উদ্দেশে বা ব্রাহ্মণকে দানের জন্য বা অন্য কোনো অভিপ্রায়ে কেউ জমি কিনতে চাইলে তাকে প্রথমে "প্রথম পুস্তপাল" বা প্রধান রেকর্ড-কীপারের কাছে আবেদন করতে হত। প্রথম পুস্তপাল দেখে শুনে জরিপ করে ভালো রিপোর্ট দিলে তবে উপরিক এবং অধিষ্ঠানাধিকরণ সেই ক্রয় বা দান মঞ্জুর করে স্থানীয় "মহত্তর" বা মুখ্যব্যক্তিদের উদ্দেশ করে তাম্রশাসন দান বা তাম্রপট্ট উৎকীর্ণ করতেন। তাম্রশাসনে এই সব কর্মচারীর ও স্থানীয় মুখ্য-

ব্যক্তিদের নাম লেখা আছে। এই-সব নাম এখনো বাংলা দেশেই প্রচলিত। বাঙালী ভদ্রলোকের নাম ও পদবী যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল তা এর থেকে প্রমাণিত হয়। উদাহরণহিসাবে কতকগুলি নাম এখানে দেওয়া গেল। মনে রাখা দরকার যে কায়স্থ শব্দ তখন বৃত্তিবাচক ছিল, জাতিবাচক নয়।

নগর-শ্রেষ্ঠী—ধৃতিপাল, রিভুপাল।
প্রথম-সার্থবাহ—বন্ধুমিত্র, বসুমিত্র, স্থাণুদত্ত।
প্রথম-কুলিক—ধৃতিমিত্র, বরদত্ত, মতিদত্ত।
কুলিক—ভীম।
প্রথম-কায়স্থ—শাম্বপাল, বিপ্রপাল, স্কন্দপাল, নয়সেন।
কায়স্থ—নরদত্ত, প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, কৃষ্ণদাস।
প্রথম-পুস্তপাল—নরনন্দী, গোপদত্ত, ভটনন্দী, দিবাকরনন্দী।
পুস্তপাল—রিশিদত্ত, জয়নন্দী, রিভুদত্ত, পত্রদাস, বিষ্ণুদত্ত, বিজয়নন্দী, স্থাণুনন্দী, সিংহনন্দী, যশোদাম, জন্মভূতি, জয়দাস, ধৃতিবিষ্ণু, রামদাস, হরিদাস, শশিনন্দী।
অধিকরণ-মহত্তর—সোমঘোষ।
বীথী-মহত্তর—হিমদত্ত, সুবর্ণযশ, ধনস্বামী, যষ্টিদত্ত, শ্রীদত্ত।
কুটুম্বী (অর্থাৎ গৃহস্থ)—যশোবিষ্ণু, কুমারবিষ্ণু, কুমারভব, কুমারভূতি, শিবকুণ্ড, বসুশিব, অপরশিব, দামরুদ্র, কৃষ্ণমিত্র, মঘশর্মা, ঈশ্বরচন্দ্র, রুদ্রভব, শ্রীনাথ, হরিশর্মা, অলাতস্বামী, ব্রহ্মস্বামী, রুষ্টশর্মা, কৃষ্ণদত্ত, নন্দদাম, অহিশর্মা, মহাসেনভট্টস্বামী, গুপ্তশর্মা, ক্রমশর্মা, শুক্রশর্মা, কৈবর্তশর্মা, হিমশর্মা, সর্ববিষ্ণু, ভবনাথ, গুহবিষ্ণু, ভবদত্ত, সোমবিষ্ণু, লক্ষ্মণশর্মা, নারায়ণদাস, বীরনাগ, রাজ্যনাগ, রামস্বামী, রতিভদ্র, অচ্যুতভদ্র, প্রভমিত্র, প্রভকীর্তি, ভবরক্ষিত, পিচ্চকুণ্ড, প্রবরকুণ্ড, সর্বদাস, গোপাল, (ভট্ট) বামনস্বামী, জীবস্বামী, মহিদত্ত, রাজ্যদত্ত, (খাড়্গি) হরি, (খাড়্গি) গোইক, (খাড়্গি) ভদ্রনন্দী, (বাহনায়ক) হরি, নাথশর্মা।
ব্রাহ্মণী—রামী, অব্বোকা, উজ্জ্বলা, পাই।

দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর চলিত নামে '-ওক' প্রত্যয় খুব

দেখা যায়। যেমন, রীয়োক, গাঙ্গোক, পুণ্ড্রোক, বাথোক, নিব্বোক ইত্যাদি। খুষক, রুমক—এগুলিও এই পর্যায়ের নাম।

বংশপরম্পরাক্রমে সেকালের লোকের কেমন নামকরণ হত তারও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। নামগুলি নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর।

বৃদ্ধ প্রপিতামহ	প্রপিতামহ	পিতামহ	পিতা	পুত্র
গর্গ, পত্নী ইচ্ছা	দর্ভপাণি, পত্নী শর্করা	সোমেশ্বর, পত্নী রল্লা	কেদার-মিশ্র, পত্নী বব্বা	গুরব-মিশ্র (ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রী)।
		ভোগট	সুভট	তাতট (শিল্পী)।
		রিষিকেশ	মধুসূদন	কৃষ্ণাদিত্য (শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ)।
		যোগদেব	বোধিদেব	বৈদ্যদেব (ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রী ও রাজা), ভ্রাতা বুধদেব।
	বৎস-স্বামী	প্রজাপতি-স্বামী	শৌনক-স্বামী	বটেশ্বর-স্বামী (মহাভারত-পাঠক ব্রাহ্মণ)।
	ধূর্তঘোষ	বালঘোষ	ধবলঘোষ, পত্নী সম্ভাবা	ঈশ্বর ঘোষ (মহামাণ্ডলিক ও স্বাধীন রাজা)
	পীতাম্বর	জগন্নাথ	বিশ্বরূপ	রামদেব-শর্মা (ব্রাহ্মণপণ্ডিত)।
	রত্নাকর	রহস্কর	ভাস্কর	উদয়কর-শর্মা (ঐ)।
	বরাহ	ভদ্রেশ্বর	লক্ষ্মীধর	বাসুদেব-দেবশর্মা (ঐ)।
	ধর্মো	মনদাস	বৃহস্পতি	শূলপাণি (রাণক, অর্থাৎ শিল্পী)।

মিত্র, দত্ত, পাল ইত্যাদির তো কথাই নাই, দাম (দাঁ), ভূতি (হুই), বিষ্ণু, যশ, শিব (শী), চন্দ্র, রুদ্র, স্বামী (সাঁই), ভদ্র (ভড়) ইত্যাদি পদবী এখনো বাঙ্গালীর নিজস্ব।

বিষয়পতির অর্থাৎ বিষয়ের প্রধান রাজকর্মচারীর পদের নাম ছিল "নিযুক্তক" বা "আযুক্তক"। ইনি সাধারণত উপরিকের দ্বারা নিযুক্ত হতেন, কখনো কখনো রাজধানী থেকেও আসতেন। তাম্রপট্টলিপিতে এই কয়জন বিষয়পতির নাম পাই—(কুমারামাত্য) বেত্রবর্মা, (কুমারামাত্য) কুলবৃদ্ধি, (কুমারামাত্য) বেরঞ্জস্বামী, অচ্যুতদাস, শণ্ডক, স্বয়ম্ভুদেব, জজ্জাব, গোপালস্বামী। বিষয়পতিরও একটি সাহায্যকারী শাসনপরিষদ ছিল—"বিষয়াধিকরণ"।

বীথীর শাসনকর্তা ছিল কি না, থাকলে তার পদের নাম কি ছিল, তা জানতে পারা যায় নি। তবে বীথীরও শাসনপরিষদ ছিল—"বীথ্যধিকরণ"। বীথীর অন্তর্ভুক্ত গ্রামের "মহত্তর", "কুটুম্বী" এবং "অগ্রহারীণ" অর্থাৎ ব্রহ্মত্রভোগী প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হত। বর্ধমান জেলায় মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসনলিপিতে একটি বীথী-অধিকরণের সভ্যদের নামের তালিকা আছে।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে যে-সব স্থানীয় শাসনকর্তা স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা প্রধানত পূর্বের শাসনপদ্ধতিরই অনুসরণ করেছিলেন। তার পর যখন থেকে পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল তখন থেকে রাষ্ট্রশাসনে রাজশক্তির একছত্র প্রভুত্বের প্রবর্তন হল। নির্দিষ্ট পৌরকার্যের বাইরে জনসাধারণের কোনো ক্ষমতা রইল না। অথচ পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণের যে কতটা হাত ছিল তা গোপালদেবের নির্বাচনে বোঝা যায়।

৩

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে দেশ অশান্তি-অরাজকতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত, তারা সর্বদা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। রাজ্যের ভিতরেও স্বস্তি নেই,—রাজসভায় চক্রান্ত, রাজান্তঃপুরে ব্যভিচার ও ষড়যন্ত্র। তার উপর পুনঃপুন বহিঃশত্রুর আক্রমণ। এই অবস্থায় প্রজারা গোপাল নামে এক প্রবীণ ও বিচক্ষণ যোদ্ধা সামন্তকে গৌড়ের সিংহাসনে নির্বাচিত করলেন। এই কথা জানতে পারি গোপালদেবের পুত্র মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেবের শাসন থেকে।

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া॥

[তাঁর অর্থাৎ বপ্যটের পুত্র নৃপতিশিরচূড়ামণি সেই শ্রীগোপালকে প্রজাবৃন্দ রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়েছিলেন দেশে মাৎস্যন্যায়-দূরীভূত করবার জন্যে। দিগন্তে বিস্তৃত যাঁর সনাতনযশোরাশি জ্যোৎস্না-ধবলিত পূর্ণিমা-রজনীর দ্বারা কথঞ্চিৎ অনুকৃত হতে পারে।]

গোপালদেব সম্ভবত গৌড়েশ্বরের কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী দেদ্দদেবীকে বিবাহ করে গৌড়-সিংহাসন লাভ করেছিলেন। তাঁর নির্বাচন দেদ্দদেবীর পাণিপ্রার্থিরূপেই হয়েছিল বলে মনে হয়। ঘরজামাই গোপালদেব গৌড়-বঙ্গকে একচ্ছত্র শাসনে এনেছিলেন।

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেব তীরভুক্তি, মগধ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশ-গুলিতে অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন এবং কান্যকুব্জ বিজয় করে উত্তরাপথের দণ্ডনায়ক হয়েছিলেন। পূর্বে বা পরে আর কোনো বাঙালী রাজা আর্যাবর্তের রাষ্ট্রব্যাপারে এতখানি কর্তৃত্ব করতে পারেন নি।

পাল-বংশীয় রাজাদের মধ্যে অনেক বড় বড় যোদ্ধা জন্মেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে পারি প্রথম মহীপালদেবের আর রামপাল-

দেবের। প্রথম মহীপালদেবের রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর রাজ্যকালে বাংলা দেশে তক্ষণ-শিল্পের সবিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই সময়ে নির্মিত বহু সুন্দর সুন্দর দেবমূর্তি পাওয়া গেছে।

রামপালদেব উৎকল ও কলিঙ্গ বিজয় করেছিলেন এবং কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাজিত করে পিতৃভূমি বরেন্দ্রীর উদ্ধারসাধন করেছিলেন। তার পর ইনি গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে রামাবতী নগর নির্মাণ করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। রামাবতী পাল-রাজাদের শেষ রাজধানী। এই নগরের সমৃদ্ধি পরবর্তী কালে ইতিকথায় পরিণত হয়েছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে গৌড়েশ্বরের রাজধানী রমতী এই রামাবতী।

রামপালদেবের ধর্মনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল তাঁর রণনৈপুণ্যেরই সমান। সেকশুভোদয়া থেকে জানা যায় যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র (রাজ্যপাল?) এক নারীর উপর অত্যাচার করেছিল বলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। রামপালদেবের অপর দুই পুত্র পিতার যোগ্য ছিল না বলে তিনি নিজেকে অপুত্রক মনে করতেন। তাই মৃত্যুকালে তিনি সন্তানতুল্য প্রিয় প্রজাগণের উপর তাঁর ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করবার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। "পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমণি" মহারাজাধিরাজ রামপালদেব সুবৃদ্ধবয়সে গঙ্গানীরে বিষ্ণুপদধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন; তাঁর বিয়োগে প্রজারা পিতৃহীন সন্তানের মত অনাথভাবে হাহাকার করেছিল। রামপালদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে বিজয়সেনদেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিজয়সেন সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অতঃপর পাল-রাজারা কিছুকাল ধরে মগধে ও উত্তরবঙ্গের কিয়দংশে রাজত্ব করতে থাকেন। রামপালদেবের মৃত্যু ও বিজয়সেনদেবের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে সেকশুভোদয়ায় একটি চমৎকার কাহিনী আছে। সেটি এখানে যথাযথ অনুবাদ করে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণসেনদেবের পিতামহ বিজয়সেন প্রথমে ছিল অতি গরীব কিন্তু

বিশেষ শিবভক্ত। নিত্য কাঠ কুড়িয়ে সে সাত বুড়ি কড়ি পেত, তাতেই তাকে জীবিকানির্বাহ করতে হত। তার থেকে স্ত্রীর ভয়ে লুকিয়ে পাঁচ কড়া কড়ি নিয়ে প্রত্যহ শিবপূজা করত। আশ্বিন মাসে একদিন অতিশয় বৃষ্টির হেতু কাঠ কুড়ানো হল না। সেদিন সে দা বাঁধা দিয়ে সাত বুড়ি কড়ি এনে গৃহিণীকে দিলে। পরদিন বিজয়সেন যার ঘরে দা বাঁধা দিয়েছিল তার ঘরে গেল। তার কাছে অনেক কাকুতি করেও দা পাওয়া গেল না। তখন ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলতে চলতে সে ভাবতে লাগল, আমি ঘরে গেলে গৃহিণী তিরস্কার করবে, অতএব আমি এই প্রান্তরে বেলগাছের তলায় বসি। শিবের পূজা আজ হল না। এই করে সে বেলতলায় রইল, একটু রাত হলে শিব স্মরণ করে সেইখানেই শুয়ে পড়ল। কাবাড়িকে পাছে বাঘে খায় এই ভেবে শিব সেখানে এসে তাকে বললেন, ওহে কাবাড়ি কি করছ? কাবাড়ি বললে, তোমার তাতে কি? তুমি ভেবেছ এ ঘুমিয়েছে; আমি ঘুমোই নি জেগে আছি, তুমি আমার কাপড়-চোপড় চুরি করতে এসেছ কিন্তু হাতে লাঠি দেখছ না; যাও! পুনরায় শিব তাকে বললেন, বাঘে মারবে, উঠে পালা হতভাগা। সে বললে, তুমি হতভাগা; আমার স্ত্রী পুত্র আছে, ঘরে ভাঙ্গা খোরা আছে, কলসীতে খুদ আছে, তা হলে আমি হতভাগা কিসে? শিব আবার বললেন, তুমি ঘরে যাও, কেন অরণ্যে রয়েছ। সে শিবকে বললে, আমি যার কাছে দাখানা বন্ধক দিয়েছি সে আমাকে দা দিলে না। তোমার কথায় ঘরে যাই আর কি! আমার ভার্যা মুখরা, আমাকে তর্জন করবে, আমার শিবকে মন্দ বলবে। তাই আমি ঘর যাব না। তুমি আমার ঘরের কথা জান না তো।

এমন সময়ে রামপাল অনশনে দেহত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে গঙ্গায়

এসেছেন। লোকেরা কাঁদছে দেখে রামপাল তাদিকে বললেন, ওহে জনপদবাসিগণ, আমার সব কথা তোমরা পালন করো। শিবের প্রসাদে আমি বাহান্ন বছর রাজত্ব করলুম। অপুত্রক আমি এখন মরতে চাই। তোমরাই আমার পুত্র। তোমাদের কারণে আমি নিজের ছেলেকে শূলে দিয়েছি। তাই সকল প্রজা মিলে যেন অবশ্য আমার শ্রাদ্ধ করে। আমি মরলে যে কেউ রাজা হবে আমি তার দাসের দাস—যে আমার কীর্তি বিনষ্ট করবে না, যে ব্রাহ্মণের জীবিকা, ধার্মিকের জীবিকা, অন্ধাদি আতুরের বৃত্তি লোপ করবে না। আতুর, ব্রাহ্মণ এবং আমার ভৃত্যদের যে রাজা পালন করবে সে যেন চিরদিন জয়যুক্ত হয়। এই বলে রামপাল মৌনাবলম্বন করলে প্রজারা কাঁদতে লাগল, আজ আমরা পিতৃহীন হলুম। রাজা অন্তর্জলি হয়ে রইলেন, মহিষী তাঁর কাছে বসে রইল।

এদিকে শিব রাত্রে আবার বিজয়সেনকে তার দা দেখিয়ে বললেন, ওহে কাবাড়ি, সকাল বেলায় গঙ্গাতীরে যেয়ো, সেখানে তোমাকে এই দা দেবো। দা দেখে সে একমুখ হেসে শিবকে বললে, তুমি অমুকের ঠাঁই দা পেয়েছ? শিব তাকে বললেন, যেখানে হোক পেয়েছি। গঙ্গাতীরে যেখানে রামপাল রাজা অন্তর্জলি হয়ে রয়েছে সেখানে যেয়ো। সেখানে তোমাকে দা দেওয়া হবে। এই বলে শিব চলে গেলেন। সেই রাত্রেই শিব গিয়ে মন্ত্রী সহদেবঘোষকে বললেন, ওহে সহদেবঘোষ, আগামী দিনে সাতঘড়ির পর রামপাল মরবে। সে মরলে বিজয়সেন নামে এক কাবাড়ি সেখানে আসবে লাঠি হাতে নিয়ে। অভিষেক করে তাকে রাজা করো। এই বলে শিব চলে গেলেন। তার পর রজনী সুপ্রভাত হলে বিজয়সেন লগুড়হস্তে সেখানে গেল।

রামপালদেব জাহ্নবীতীরে বিষ্ণুপদ ধ্যান করতে করতে শেষ-

নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ঠিক সেই সময়ে সহদেবঘোষ বিজয়সেনকে আসতে দেখলে। তখন এক সেবককে মন্ত্রী বললে, ঐ লগুড়ধারী লোকটিকে এখানে আন। সেবক তাকে নিয়ে আসছে। বিজয়সেন তাকে বললে, আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন ? তাকে সেবক বললে, তুমি জান না কি যে রাজা রামপাল সুস্থ হয়েছেন, তাঁর কল্যাণে মন্ত্রী বলিদান করবেন। কিন্তু কোনো লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি অনাথ এবং দীন, তাই তোমাকে বলিদানের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। তাই শুনে সে বহুতর কাকুতি করলে, আমি অনাথ নই, আমার পুত্র কলত্র রয়েছে। মন্ত্রী বললেন, শীঘ্র নিয়ে এস। সে কাঁদতে লাগল। পাত্র বললে, একে স্নান করাও। সে বললে, আমাকে স্নান করাচ্ছ কেন ? পাত্র বললে, একে চন্দনচর্চিত কর। সে বললে, আমাকে চন্দনচর্চিত করলে কেন ? সেবক বললে, মূঢ়, এও জান না যে যাকে বলি দেওয়া হয় তাকে স্নান করান হয়, চন্দনলিপ্ত করা হয় ? সে বললে, আমাকে রক্ষা কর। তার পর মন্ত্রী তাকে আনিয়ে বললে, আপনি কাঁদছেন কেন ? সে বললে, মন্ত্রী, আমাকে কি বলিদানের জন্যে আনা হয়েছে ? মন্ত্রী তখন হাহা করে উঠল, ভয় করবেন না, সুস্থ হোন, বস্ত্র অলঙ্কার পরুন। তার পর মন্ত্রী বললে, আপনার নাম কি ? সেন বললে, আমার নাম বিজয়সেন। তখন মন্ত্রী স্বয়ং তাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিয়ে দিয়ে অমাত্যদের বললে, তোমরা শোন, আজ রাত্রে রুদ্র স্বয়ং আমাকে বলেছেন—হে মন্ত্রী, বিজয়সেন নামে কাবাড়ি হাতে লাঠি নিয়ে গঙ্গাতীরে আসবে, তাকে রাজা করো—এখন যদি শিববাক্য রাখ তবে একে রাজা করা হোক। তখন সকলে শিববচন মাথায় ধরে, মহাকুলসম্ভব এই আগন্তুক—এই ভেবে তাকে রাজা করলে। সে রাজ্য পেয়ে রামপালের ঔর্ধ্বদৈহিক করলে।

একদিন সব অমাত্য বললে, রাজা, আদেশ করুন আমরা কি করবো বা করাবো। রাজা বললে, হে মন্ত্রিগণ, আমি দাখানা এখনও পাইনি। এই শুনে অমাত্যরা সকলে সহদেবঘোষ মন্ত্রীকে মারতে গেল। সে মন্ত্রীও পালালো। ঘরে গিয়ে নিরাহারে রইল। সাক্ষাৎ শিবের বচনে একে রাজা করা হল। শিবও উন্মত্ত, যেহেতু কাষ্ঠ-জীবীকে রাজা করে। আমিও উন্মত্ত। ও রাজাও মূর্খ, রাজত্ব পেয়ে দাখানা চায়। অতএব তিন পাগলের ব্যাপার হল। এই ভেবে মন্ত্রী শুয়ে পড়ল। রাত্রে শিব এসে বললেন, হে মন্ত্রী, ভয় করো না। বার দিনে দারিদ্র্যজ্বালা পালায়। আগামী দিনে ভাল হবে। পরদিন প্রাতে সকলে সমবেত হয়ে মন্ত্রীর কাছে এসে শুভ সমাচার দিলে। অপরদিন রাত্রে স্বয়ং শিব এসে বিজয়সেনকে বললেন, হে রাজা, ভয় করো না, সুস্থ হও। তোমরা সাত-পুরুষ রাজত্ব করবে। কেউ বলাবল করতে পারবে না। তোমাকে শব্দভেদী বিদ্যা দিচ্ছি। তুমি তোমার পুত্রকে এই বিদ্যা দিও। সেও তার পুত্রকে দেবে। এই করে সাত পুরুষ দুর্জয় হবে।

৪

গুপ্ত-সম্রাট্‌দের আমলে এবং তার কিছুকাল পর অবধিও দেশের শাসনকার্যে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কিছু হাত ছিল না। তাম্রপট্টানুশাসনে উপরিক আযুক্তক অথবা অধিষ্ঠানাধিকরণের সদস্যদের নামের মধ্যে ব্রাহ্মণের নাম নেই বললেই হয়। এর কারণ সম্ভবত এই হতে পারে যে ব্রাহ্মণেরা তখন সংখ্যায় অল্প, নবাগত ও ব্রহ্মত্রভোগী বলে ক্ষমতাহীন এবং একান্তভাবে হোমপূজা-অধ্যয়ন-নিরত ছিল। পরে ক্রমশ সংখ্যায় ও ক্ষমতায় ব্রাহ্মণেরা যেমন সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করতে লাগল অমনি সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও পৌর শাসনকার্যে

জন-সাধারণের ক্ষমতাও কমে আসতে লাগল। পাল-চন্দ্র-বর্ম-সেন রাজাদের সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রজামণ্ডলীর কোনো হাত ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও সেনাপতিদের বলবুদ্ধিবীর্যের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য ছিল। পাল-নরপতিরা "পরমসৌগত" অর্থাৎ বুদ্ধোপাসক হলেও তাঁদের মন্ত্রীরা ছিলেন বিষ্ণূপাসক ব্রাহ্মণ। ধর্মপালদেবের ও তাঁর বংশধরগণের রাজ্যপালনে ও বিজয়ে কৃতকার্যতার মূলে ছিল তাঁদের মন্ত্রিবংশের বুদ্ধি ও কৌশল। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় গর্গদেব, তৎপুত্র দর্ভপাণি, তৎপুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্র কেদার-মিশ্র ও তৎপুত্র ভট্ট গুরবমিশ্র যথাক্রমে ধর্মপালদেব, দেবপালদেব, শূরপালদেব (বিগ্রহ-পালদেব) ও নারায়ণপালদেবের মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। গুরব-মিশ্র যেমন শাস্ত্রানুশীলনে ও বাগ্মিতায় তেমনি মন্ত্রণায় ও যুদ্ধবিদ্যায় নিষ্ণাত ছিলেন। পাল-সম্রাটেরা এই মন্ত্রীদের যে কতটা সম্মান করতেন তা নারায়ণপালদেবের অনুশাসন ও গুরব-মিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায়। পাল-বংশের শেষদিকের তিন রাজারও উপযুক্ত মন্ত্রিবংশ ছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালদেব, রাম-পালদেব ও কুমারপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে যোগদেব, তৎপুত্র বোধি-দেব ও তৎপুত্র বৈদ্যদেব। মহামন্ত্রী বৈদ্যদেব ছিলেন বড় যোদ্ধা ও সেনাপতি। দক্ষিণবঙ্গে একটি নৌযুদ্ধে ইনি বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন, কমৌলিতে প্রাপ্ত এঁর অনুশাসনে একথা আনুষঙ্গিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে সেকালের নৌযুদ্ধের একটি গতানুগতিক কবিত্বমণ্ডিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

যস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গরজয়ে নৌবাটহীহীরব-
ত্রস্তৈর্দিককরিভিশ্চ যন্ন চলিতং চেন্নাস্তি তদ্‌গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুককেনিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ-
রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥

[যাঁর দক্ষিণবঙ্গ-সংগ্রামজয়ে নৌবাহিনীর হীহীরবে ত্রস্ত হ'য়ে দিগ্‌গজেরা যে পলায়ন করে নি তার একমাত্র কারণ তাদের যাবার স্থান ছিল না,

উপরন্তু দাঁড়গুলির উৎক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলকণা যদি আকাশে স্থিরতা পেত তবে শশীর কলঙ্ক মুছে যেত।]

বৈদ্যদেব কামরূপ বিজয় করে সেখানে রাজা হয়েছিলেন। তাঁর এই অনুশাসন রচনা করেছিলেন কবি মনোরথ।

আর এক অদ্ভুতকর্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ হরিবর্মদেবের মহামন্ত্রী উত্তররাঢ়ার অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রাম-নিবাসী সাবর্ণগোত্রীয় "বালবলভীভুজঙ্গ" ভট্ট ভবদেব। শাস্ত্রে আর শস্ত্রে এঁর ছিল তুল্য ব্যুৎপত্তি। ভবদেবের স্মৃতি-নিবন্ধ এখনও চলে। ভুবনেশ্বরে ইনি অনন্তবাসুদেবের মন্দির আর নারায়ণ-অনন্ত- ও নৃসিংহ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে এঁর কুলপ্রশস্তি-লিপি পাওয়া গেছে। ভবদেবের সুহৃদ্ কবি বাচস্পতি এই ক্ষুদ্র প্রশস্তি-কাব্যটি লিখেছিলেন। ভবদেবের পূর্তকীর্তির উল্লেখ করেছেন কবি বাচস্পতি এইভাবে

রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎপ্রাণাশয়প্রীণনঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-
বক্ত্রাব্জপ্রতিবিম্বমুগ্ধমধুপীশূন্যাব্জিনীকাননঃ॥

[রাঢ়দেশে জলহীন জাঙ্গলপথযুক্ত গ্রামোপকণ্ঠসীমায় শ্রমার্ত পান্থসমূহের প্রাণমনের প্রীতিদায়ক জলাশয় যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে জলাশয়-সকলের পরিসরবক্ষে স্নানরত কুলকামিনীগণের প্রতিবিম্বিত মুখারবিন্দ দেখে মুগ্ধ মধুপগণ পদ্মবন শূন্য করে চলে এসেছে।]

সেন-রাজাদের অমাত্যবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণও ছিল, কায়স্থ প্রভৃতি অন্য জাতিও ছিল। লক্ষ্মণসেনদেবের সভাসদ্-মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন সেকালের কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি—উমাপতিধর, গোবর্ধন-আচার্য, জয়দেব-মিশ্র, শরণ এবং ধোয়ীক (বা ধোয়ী)। উমাপতিধর ছিলেন দীর্ঘজীবী। ইনি লক্ষ্মণসেনদেবের পিতা বল্লালসেনদেবেরও মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। রাজশাহী জেলায় দেওপাড়া গ্রামে

প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের ভগ্নমন্দিরের পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তি এঁরই রচনা। উমাপতি বহু খণ্ড কবিতা রচনা করে গেছেন। এঁর বাগ্‌বাহুল্যের উপর কটাক্ষ করে জয়দেব বলেছেন—বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ।

আচার্য গোবর্ধন হালের প্রাকৃত-কাব্য গাথাসপ্তশতীর অনুসরণে সংস্কৃত-কাব্য আর্যাসপ্তশতী রচনা করেছিলেন। এই কার্যে সহায়তা করেছিল তাঁর শিষ্য উদয়ন এবং ভাই বলভদ্র। গোবর্ধনের পিতা নীলাম্বরও ভাল কবি ছিলেন। কাব্যের উপোদ্ঘাতে গোবর্ধন ভবভূতির পরেই পিতার বন্দনা করেছেন। ব্রাহ্মণ্যে ও তেজস্বিতায় গোবর্ধন-আচার্য লক্ষ্মণসেনদেবের সভায় মুখ্য আসন পেয়েছিলেন। এবিষয়ে একটি গল্প আছে সেকশুভোদয়ায়। লক্ষ্মণসেনদেবের সুয়ো রাণী বল্লভার এক ভাই ছিল কুমারদত্ত, ভারি অত্যাচারী। সে একদা এক বণিক্‌বধূ মাধবীর উপর অত্যাচার করতে যায়। মাধবীর চীৎকারে লোকজন এসে পড়ে কুমারদত্তকে মন্ত্রীদের কাছে ধরে নিয়ে যায়। রাজার প্রিয়পত্নীর ভাই বলে মন্ত্রীরা স্বয়ং শাস্তি দিতে অসমর্থ হয়ে মাধবীকে রাজসভায় যেতে বলেন। প্রজারা সব মাধবীকে নিয়ে রাজসভায় গেলে মন্ত্রীরাও সেখানে হাজির হলেন। রাজার কাছে প্রজারা সাহস করে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না দেখে জগদ্‌গুরু গোবর্ধনাচার্য বল্‌লেন, “ভো জনাঃ কার্যং বদত।” তখন সাহস পেয়ে মাধবী আত্মীয়-কুটুম্বদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সব কথা বললে। ইতিমধ্যে চেড়ীর মুখে খবর পেয়ে রাজমহিষী বল্লভা এসে সভার পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। মাধবীর অভিযোগ শুনে বল্লভা ভ্রাতার বিরোধী মন্ত্রী উমাপতিধরকে লক্ষ্য করে বললে, “হে সভাসদাঃ, পাপিষ্ঠো অসাবুমাপতিধরঃ তস্যৈব এষা কৃত্যা ইতি বিজ্ঞায় যৎকর্তব্যং তদ্বিধীয়তাম্‌।” শুনে রাজা মন্ত্রী সভাসদ্‌ সকলে চুপ করে রইলেন। তখন মাধবী রাণীর পায়ে প্রণাম করে বললে, আপনি ধর্মপরা মাতা, সমরবিজয়ী মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের পত্নী, আমাকে ক্ষমা করুন। এই রাজ্যে এতদিন ধর্ম ছিল শাশ্বত, কেউ বলাবল করতে পারত না, এখন বুঝলুম শূরভোগ্যা

বসুন্ধরা। আপনার পিতৃকুলে কি এই ব্যবহার চলিত আছে যে যার-তার স্ত্রীকে যে-কেউ হরণ করতে পারে? তা যদি থাকে বলুন, আপনারই ভাইকে ভজনা করি। এই কথা শুনে বল্লভা ক্রোধে মাধবীর চুল ধরে টেনে পদাঘাত করলে। ভয়ে কেউ বাধা দিতে পারলে না। তখন গোবর্ধনাচার্য ক্রোধে আগুন হয়ে রাজাকে ভৎর্সনা করলেন, "ভবান্ যাদৃশো ধার্মিকস্তাবদবগতম্, শ্রীমতাং রাষ্ট্রমচিরান্নষ্টং ভবিষ্যতি।" এই বলে ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ খন্তা নিয়ে রাজমহিষীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তারপর রাণীকে ভৎর্সনা করে রাজ্যে অভিশাপ দিয়ে দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে রাজসভা ছেড়ে চললেন। কারও কিছু বলতে সাহস হল না। তখন রাজা ছুটে গিয়ে তাঁকে পায়ে ধরে নিরস্ত করলেন। নীরব সভা-সদ্দের লক্ষ্য করে তখন মাধবী বাক্যবাণ ছাড়তে লাগল। লজ্জার তাড়নায় অস্থির হয়ে রাজা নিজে খড়্গ নিয়ে কুমারদত্তকে কাটতে উঠলেন। তখন মাধবী প্রণাম করে রাজাকে নিরস্ত করলে এই বলে, মহারাজ, ও আমার হাত ধরেছিল বলে আমি মরি নি, আমার জাতও যায় নি, আমার স্বকর্মফলে এ ঘটনা ঘটেছে। আপনার কার্যে অপরাধের প্রতিকার হয়েছে, এখন ক্ষমা করুন, সকলের মনে শান্তি হোক। মাধবীর এই কথায় সভায় সাধুবাদ উঠল। কুমারদত্ত রাজ্য থেকে নির্বাসিত হল।

জয়দেব-মিশ্র ছিলেন লক্ষ্মণসেনদেবের সভার কালিদাস। প্রধানত তাঁর গীতগোবিন্দের জন্যই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা অধিকার করে থাকবে। জয়দেব কতকগুলি প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতাও লিখেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলি বীররসাশ্রিত। একটিমাত্র কবিতায় সাক্ষাৎভাবে গৌড়াধিপকে সম্ভাষণ করা হয়েছে। মনে হয় এই শ্লোকটি নিয়ে তিনি প্রথম রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন,

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।

গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজকসভালঙ্কার কারার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্॥

[হে লক্ষ্মীর কেলিনায়ক, হে জঙ্গমহরি, হে যাচকের কল্পদ্রুম, হে মুক্তি-সাধকের সহায়ক, হে যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম, হে বঙ্গের প্রিয়, হে গৌড়েন্দ্র, হে রাজপ্রতিনিধি-সামন্তরাজ-মণ্ডিত সভামণ্ডপের অলঙ্কার, হে বন্দীকৃত-অরিরাজমণ্ডল, হে সজ্জনের পালক, তোমাকে দেখলুম এবং এতেই আমরা তুষ্ট।]

বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল, এবং তদবলম্বনে রচিত লৌকিক গীতি বা পদও অপ্রচলিত ছিল না। গীতগোবিন্দের পদগুলিতে সমসাময়িক পদাবলীর পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। এগুলি বাংলা সাহিত্যেরও সূচনা করেছে।

শরণের কোন কাব্য পাওয়া যায় নি, তবে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতা পাওয়া গেছে। একটি শ্লোকে লক্ষ্মণসেনদেবের বিজয়কীর্তির বর্ণনা আছে।

ভ্রূক্ষেপাদ্ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গান্
চেতশ্চেদিক্ষিতীন্দোস্তপতি বিতপতে সূর্যবদ্ দুর্জনেষু।
স্বেচ্ছাম্লেচ্ছান্ বিনাশং নয়তি বিনয়তে কামরূপাভিমানং
কাশীভর্তুঃ প্রকাশং হরতি বিহরতে মূর্ধ্নি যো মাগধস্য॥

[ইনি ভ্রূক্ষেপমাত্রে গৌড়লক্ষ্মীকে জয় করেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে কলিঙ্গদেশ বিজয় করেছেন, চেদিরাজের চিত্তে ক্লেশ দিয়েছেন, সূর্যের মত দুর্জন-দিগের উপর তাপ বৃষ্টি করেছেন, ইচ্ছামাত্রে ম্লেচ্ছদিগের বিনাশ সাধন করেছেন, কামরূপাধিপতির অভিমান লোপ করেছেন, কাশীশ্বরের কীর্তি হরণ করেছেন এবং মাগধরাজের উপর প্রভুত্ব করেছেন।]

তুর্কিদের সঙ্গে যে লক্ষ্মণসেনদেবের যুদ্ধ বা সংঘর্ষ হয়েছিল এবং তাতে যে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন তার অবান্তর প্রমাণ পাওয়া যায় উমাপতিধর রচিত ম্লেচ্ছরাজের প্রশংসাসূচক এই শ্লোকে,

সাধু ম্লেচ্ছনরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূর্
নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ত্ততে।
দেবে কুট্যতি যস্য বৈরিপরিষন্মারাঙ্কমল্লে পুরঃ
শস্ত্রং শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ॥

[ম্লেচ্ছরাজ, সাধু সাধু। আপনার মাতাই যথার্থ বীরপ্রসবিনী। নীচ হলেও আপনার মত লোকের জন্যই পৃথিবী এখনো সুক্ষত্রিয় রয়েছে, কেননা মারাঙ্কমল্লদেব (মদন-বিরুদযুক্ত বীর লক্ষ্মণসেন) যখন সাক্ষাৎভাবে শত্রুসৈন্য বিধ্বংস করছিলেন তখন জিহ্বারূপ পত্রান্তরাল হতে 'শস্ত্র, শস্ত্র'—আপনার এই বাক্য ঘন ঘন নির্গত হচ্ছিল।]

ধোয়ী (বা ধোয়ীক) ছিলেন জাতিতে তন্তুবায়। কি করে যে ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন সে বিষয়ে সেকশুভোদয়ায় একটি গল্প আছে। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনদেব একদা চারজন ব্রাহ্মণকে পাঠিয়েছিলেন গঙ্গাতীরে মন্ত্রপুরশ্চরণ করতে। তাদের সঙ্গে তন্তুবায় ধোয়ী গিয়েছিল চাকর হয়ে। একদিন ব্রাহ্মণেরা ধোয়ীকে বললে, ওরে তোর সঙ্গে আজ আমরা বাড়ি যাব। ধোয়ী উত্তর করলে, বামুন-মশায়রা, তোমাদের কথা রাজা জানতে পারলে ক্ষমা করবে, আমার কথা শুনলে হাত পা কেটে দেবে। তখন ব্রাহ্মণেরা ধোয়ীর হাত পা বেঁধে তাকে যজ্ঞস্থানে রেখে বাড়ি চলে গেল। সেই রাত্রে সেখানে সরস্বতীর আবির্ভাব হল। সরস্বতী ডেকে বললেন, ব্রাহ্মণ চারজন কোথা গেল। তখন তন্তুবায় উত্তর করলে, মা দেবী, তারা আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ে নিজের নিজের ঘর চলে গেছে। শুনে দেবী বললেন, বন্ধনমুক্ত হয়ে আমার কাছে এস। ধোয়ী তাঁর কাছে গিয়ে বারবার প্রণাম করতে লাগল। দেবী তার বন্ধনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে ধোয়ী সব কথা বললে। তখন দেবী বললেন, তারা এক বছর ধরে আমার উপাসনা করছে। আমি আজ উপাসনার ফল দিতে এসেছি। যজ্ঞমণ্ডপে জলভরা কলসী

আছে, সেই জল যেন তারা এসে খায়। এই বলে দেবী অন্তর্হিত হলে ধোয়ী মনে মনে ভাবতে লাগল, বামুনেরা আমাকে বেঁধে রেখে গিয়েছিল, সুতরাং কিছুতেই তাদিকে মন্ত্রপূত জল দেওয়া হবে না। এই ভেবে সে সেই জল আকণ্ঠ পান করলে, যেটুকু বাকি রইল তা গঙ্গায় ঢেলে দিয়ে এল। সেই থেকে ধোয়ী পরম পাণ্ডিত্য শ্রুতিধরতা ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী হল।

ধোয়ীর রচিত অনেক কবিতা পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে পবনদূত। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে যতগুলি "দূত"-কাব্য লেখা হয়েছিল এটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধোয়ী ছিলেন লক্ষ্মণসেনদেবের সভাকবি। মহারাজাধিরাজ এঁকে "কবি-ক্ষ্মাপতি" বা কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন এবং তার প্রতীক বা পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণাভরণমণ্ডিত হস্তিব্যূহ ও হেমদণ্ডযুক্ত দুই চামর উপহার দিয়েছিলেন। এ কথা বলে গেছেন কবি তাঁর পবনদূত কাব্যের উপসংহারে,

দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরে হেমদণ্ডে
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী।
শ্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতিহেতোর্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব মহামন্ত্রমেতজ্জগাদ ॥

সেকালের রাজারা কবি-পণ্ডিতদের এই-রকম করেই সম্মান দেখাতেন। উমাপতিধর বলে গেছেন যে চন্দ্রচূড়চরিত কাব্য রচনার জন্য রাজা চাণক্যচন্দ্র অন্তরঙ্গ কবিকে নানাবিধ রত্নালঙ্কার বহু স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা এবং একশত গ্রাম দান করেছিলেন। বাঙ্গালার পাঠান-রাজারাও অনেকে এই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন।

সেকালের কবি-পণ্ডিতদের ইহজীবনের চরম আদর্শ প্রতিধ্বনিত হয়েছে ধোয়ীর এই আত্মকথায়,

গোষ্ঠীবন্ধঃ সরসকবিভির্বাচি বৈদর্ভরীতি-
র্বাসো গঙ্গাপরিসরভুবি স্নিগ্ধভোগ্যা বিভূতিঃ।

সৎসু স্নেহঃ সদসি কবিতাচার্যকং ভূভুজাং মে
ভক্তির্লক্ষ্মীপতিচরণয়োরস্তু জন্মান্তরেঽপি ॥

[সহৃদয় কবিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য, বৈদর্ভী রীতিকে কাব্যরচনা, গঙ্গাতীর-ভূমিতে বাস, ধনৈশ্বর্য আত্মীয় স্বজনের ভোগে লাগা, সজ্জনের সহিত মৈত্রী, রাজসভায় আচার্যকবির সম্মান এবং লক্ষ্মীপতির চরণকমলে ভক্তি যেন আমার জন্মান্তরেও হয়।]

পবনদূত ধোয়ীর পরিণত বয়সের রচনা বলে বোধ হয়। শেষ শ্লোকে সংসাররসতৃপ্ত কবির অন্তিম বাসনা প্রকাশ পেয়েছে,

কীর্তির্লব্ধা সদসি বিদুষাং শীলিতাঃ ক্ষৌণীপালা
বাক্সন্দর্ভাঃ কতিচিদমৃতস্যন্দিনো নির্মিতাশ্চ।
তীরে সম্প্রত্যমরসরিতঃ ক্বাপি শৈলোপকণ্ঠে
ব্রহ্মাভ্যাসপ্রবণমনসা নেতুমীহে দিনানি ॥

[বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি, রাজার সঙ্গ করেছি, কতিপয় অমৃত-স্যন্দী কাব্য ও কবিতা রচনা করেছি। এখন চাই ভাগীরথী তীরে কোন শৈলোপকণ্ঠে ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ মন নিয়ে বাকি দিনগুলি কাটিতে দিতে।]

লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিবর্গের মধ্যে শুধু হলায়ুধ-মিশ্র সেখ জলালুদ্দীন তব্রিজির পক্ষপাতী হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রভাবেই রাজসভায় শেখের প্রসার-প্রতিপত্তি জাঁকিয়ে ওঠে—এই কথা সেকশুভোদয়ায় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে। এর কারণ এই যে তখন রাজসভায় সব চেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন হলায়ুধ। বৈদিক-ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মণ্যনিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং তার উপর লক্ষ্মণসেনদেবের বাল্যসুহৃদ্ আর সাম্রাজ্যের মহাধর্মাধ্যক্ষ। সুতরাং তাঁর সমর্থন পেলে সব দিকেই সুবিধা।

হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্বের উপক্রমে যে প্রশস্তি আছে তার থেকে অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও যেটুকু থাকে তাতে তাঁকে অসামান্য পুরুষ না বলে উপায় নেই। বর্ণনাটি দীর্ঘ হলেও এখানে উদ্ধৃত করবার উপযুক্ত।

লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে-
রাবৃত্ত্যা সদৃশী নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্ম করোদরাকমলকবদ্ ভোগোত্তরা সৎক্রিয়ে-
ত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্॥

[গুণবান্ ধনঞ্জয় জন্মদাতা। বয়সের ক্রমানুরূপ শ্রীলক্ষ্মণ নৃপতির পারিষদপদ পাওয়া গেছে। তাবৎ বাঙ্ময় শাস্ত্র হস্তামলকের মত সম্পূর্ণ অধিগত। সৎক্রিয়া ভোগে ফলবতী হয়েছে। এই কৃতী ব্যক্তির সাংসারিক প্রার্থনীয় আর কিছু নেই।]

যেনাসীদজিতং ন সিন্ধুলহরীধৌতাঞ্চলায়াং ক্ষিতৌ
যস্যাজ্ঞাতমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্।
দেবঃ স ত্রিজগন্নমস্যমহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতি-
র্নেতা যস্য মনীষিতাধিকপুরস্কারোত্তরাং সম্পদম্॥[১]

[১] লক্ষ্মণসেনদেবের "অনুপমপ্রেমৈকপাত্রং সখা" এবং "প্রতিরাজন্যকৃতমহাসামন্তচূড়ামণি" বটুদাসের পুত্র 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-সঙ্কলয়িতা মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস লিখে গেছেন

সম্রাজামিব যোগিনামপি গুরুর্যশ্চ ক্ষমামণ্ডলে
স শ্রীলক্ষ্মণসেন এব নৃপতির্মুক্তশ্চ জীবন্নভূৎ॥

[সম্রাট্‌দের মতো যোগিদেরও যিনি গুরু ছিলেন পৃথিবীতে, সেই লক্ষ্মণসেন নৃপতি জীবিতকালেই মুক্তি লাভ করেছিলেন।]

জয়দেবও লিখেছিলেন, দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্ [তোমাকে দেখেই আমরা খুশি]।

হলায়ুধ জয়দেব ও শ্রীধরদাসের উক্তি থেকে মনে হয় যে লক্ষ্মণসেন সত্যই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। যদিও তাঁর দেহাবসানের অনতিবিলম্বে বাংলা দেশে তুর্কি অভিযান শুরু হয়েছিল তবুও তাঁর রাজ্যকাল যে বাংলা দেশের একটি গৌরবময় যুগ তা অস্বীকার করা যায় না।

[সিন্ধু-লহরী যার অঞ্চল ধুয়ে দেয় এমন পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশ নেই যা যিনি জয় করেন নি, সপ্তভুবনে এমন শাস্ত্র নেই যা যাঁর অজ্ঞাত, যাঁর মহিমা ত্রিজগতের নমস্য—সেই মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনদেব তাঁর প্রার্থনার অতিরিক্ত পুরস্কারসম্পদ প্রেরণ করে থাকেন।]

বাল্যে স্থাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্তমহামহত্ত্বমুপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মসেনদেবনৃপতির্ধর্মাধিকারং দদৌ ॥

[অখিল ক্ষ্মাপালনারায়ণ শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেব নৃপতি তাঁকে বাল্যে রাজপণ্ডিত পদে স্থাপিত করে, নবযৌবনে চন্দ্রবিম্বের মত উজ্জ্বল শ্বেতচ্ছত্রমণ্ডিত মহামন্ত্রিত্ব পদ দান করে, পরিশেষে প্রৌঢ়বয়সের যোগ্য মহাধর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেছেন।]

আসীৎ কস্য ন মন্দিরে নয়নয়োর্জাতা ন কস্যাতিথিঃ
কণ্ঠে কেন ধৃতা ক্ষণং ন কুতুকাদ্ বেশ্যাঙ্গনেব শ্রুতিঃ।
ধর্মাধ্যক্ষহলায়ুধস্য সদৃশো নাস্যাঃ প্রিয়ঃ কোঽপ্যভূদ্
যঃ কৃত্বা হৃদয়েঽনুরাগতরলো নক্তং দিবা হৃষ্যতি ॥

[শ্রুতি অর্থাৎ যশ কার ঘরে না পৌঁছায়, কার চোখের গোচর না হয়, কুতূহলবশে বেশ্যা নারীর মত কার না কণ্ঠলগ্ন হয়। কিন্তু ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধের মত এর এমন কেউ প্রিয় ছিল না যে একে হৃদয়ে ধারণ করে অনুরাগতরল হয়ে দিবানিশি আনন্দমগ্ন থাকে।]

পাত্রং দারুময়ং ক্বচিদ্ বিজয়তে হৈমং ক্বচিদ্ ভাজনং
কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কুত্রাপি কৃষ্ণাজিনম্।
ধূপঃ ক্বাপি বষট্কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃ পরঃ ক্বাপ্যভূদ্
অগ্নেঃ কর্মফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে ॥

[কোথাও কাঠের যজ্ঞপাত্র ছড়ানো রয়েছে, কোথাও বা সোনার বাসন-পত্র। কোথাও ইন্দুধবল পট্টবস্ত্র মেলা রয়েছে, কোথাও বা কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোন স্থান ধূপের গন্ধে আমোদিত, কোন স্থানে বা বষট্‌কারধ্বনির সঙ্গে আহুতির ধূম প্রবল হয়েছে। এইভাবে তাঁর গৃহে অগ্নির এবং তাঁর নিজের কর্মফল যুগপৎ জাজ্বল্যমান রয়েছে।]

আপীয় শ্রুতিসংপুটেন হৃদয়ে সংস্থাপিতাঃ সূরিভি-
র্বিন্যস্তাঃ সুরসদ্মনিশ্চলশিলাঃ পট্টান্তরে শিল্পিভিঃ।
আবদ্ধাঃ কবিভির্বিশৃঙ্খলকথাবন্ধৈঃ প্রবন্ধৈরপি
ভ্রাম্যন্তি প্রতিপত্তনং প্রতিগৃহং প্রত্যঙ্গনং যদ্‌গুণাঃ ॥

[তাঁর গুণ মনীষীরা কর্ণ দ্বারা পান করে হৃদয়ে সংস্থাপন করেছেন, শিল্পীরা দেবমন্দিরে পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ অথবা পট্টবস্ত্রে বা পাটায় অঙ্কিত করেছেন, কবিরা বিশৃঙ্খল কথাবন্ধে অর্থাৎ গদ্যে এবং প্রবন্ধে অর্থাৎ পদ্যে গেঁথেছেন, আর তা এইভাবে প্রতি নগরে প্রতি গৃহে প্রতি অঙ্গনে ব্যাপ্ত হচ্ছে।]

মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ-মিশ্র আরও কয়েকটি স্মৃতি-নিবন্ধ ও আচার-গ্রন্থ লিখেছিলেন বা লিখিয়েছিলেন। এঁর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান অনুরূপ বই লিখেছিলেন।

৫

গুপ্ত-সম্রাট্‌দের আমলের পূর্ব থেকে বাংলা দেশে জৈন ও বৌদ্ধ মতের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনে বসাবার পর থেকে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য মতের প্রসার বাড়তে থাকে। কিন্তু কোন সময়েই এই তিন ধর্মমতের মধ্যে আত্যন্তিক বিরোধ ছিল না। এখন যেমন হিন্দু-ধর্মের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব মত নিয়ে কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব নেই তখনো তেমনি জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মত নিয়ে সামাজিক বিরোধ ছিল না।

ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বীরা জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরে দেবপূজার বন্দোবস্ত করতে পরাঙ্মুখ হত না এবং বৌদ্ধ-মতাবলম্বীরাও গঙ্গাজল স্পর্শ করে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে ভূমিদান করতে কুণ্ঠিত হত না। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত তাম্রপট্টলিপি থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাঁর স্ত্রী রামী বটগোহালী গ্রামের জৈনবিহারে ভগবান্ অর্হৎদিগের নিত্যপূজা নির্বাহের জন্যে দেড় বিঘা জমি দান করেছিলেন। ধর্মপালদেবের প্রপৌত্র নারায়ণপালদেব স্বয়ং তীরভুক্তিতে (অর্থাৎ মিথিলায়) কলশপোত গ্রামে ভগবান্ শিবভট্টারকের সহস্রায়তন নির্মাণ করিয়ে সেখানে দেবতার এবং পাশুপত-আচার্যপরিষদের "পূজা-বলি-চরু-সত্র-নবকর্মাদ্যর্থং শয়নাসন-গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারাদ্যর্থং" মকুতিকা গ্রাম দান করেছিলেন "মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তং শিবভট্টারকম্ উদ্দিশ্য"। নারায়ণপাল যে শৈব ছিলেন তা এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। তাঁর নামের পূর্বে "পরমসৌগত" উপাধির অভাবও বোঝায় যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন না। এর মূলে কি মহামন্ত্রী গুরব-মিশ্রের প্রভাব আছে?

পরবর্তী পাল-রাজারা বৌদ্ধ মত আশ্রয় করলেও ব্রাহ্মণ্য মতের পোষকতায় ত্রুটি করেন নি। "পরমসৌগত" মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব গঙ্গায় স্নান করে "মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকম্ উদ্দিশ্য" চাবটি-গ্রামবাসী পরাশরগোত্রীয় ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্য-শর্মাকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী কোটীবর্ষ বিষয়ে গোকলিকা মণ্ডলে কুবটপল্লিকা গ্রাম দান করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে "পরমসৌগত" মহারাজাধিরাজ মদনপালদেব চম্পাহিট্টি গ্রামবাসী পণ্ডিত ভট্টপুত্র বটেশ্বর-স্বামীকে একটি গ্রাম দান করেছিলেন "ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকম্ উদ্দিশ্য" পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে বেদ-ব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত শ্রবণ করাবার দক্ষিণা রূপে।

গুপ্ত-সম্রাটেরা ছিলেন "পরমবৈষ্ণব", তাই তাঁদের সময় থেকে বিষ্ণুমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও বিষ্ণুপূজার জন্য দান ক্রমশ বাড়তে থাকে। অবশ্য পূর্বে থেকেও যে

এদেশে ভাগবত মতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল তার প্রমাণ রয়েছে চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া লিপিতে। দামোদরপুর তাম্রপট্টলিপির মধ্যে একটি হচ্ছে কোকামুখ-স্বামী এবং শ্বেতবরাহস্বামীর দেউলের দুটি অতিরিক্ত প্রকোষ্ঠ নির্মাণের জন্যে দান বিষয়ে। আর একটি শাসন থেকে জানা যায় যে শ্বেতবরাহস্বামীর দেউলের "খণ্ডফুট্ট-প্রতিসংস্কারকরণায়" ও "বলি-চরু-সত্রপ্রবর্তন-গব্য-ধূপ-পুষ্প-প্রাপণ-মধুপর্কদীপাদ্যুপযোগায়" অযোধ্যা থেকে আগত কুলপুত্র অমৃতদেব কিছু ভূমি দান করেছিলেন।

বৌদ্ধ মতের প্রাদুর্ভাব বেশি ছিল উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য মত একচ্ছত্র হবার অনেক দিন পরেও ঐসব অঞ্চলে বৌদ্ধ মতের প্রাধান্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গেও যে বৌদ্ধ মত অজ্ঞাত ছিল এমন কথা বলা চলে না। মধ্যবঙ্গ অঞ্চলে কায়স্থদের মধ্যে মহাযান-শাস্ত্রের অনুশীলন পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্তও ছিল।

অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা মহযান-মতের একটি প্রসিদ্ধ বই। একাদশ শতাব্দীতে প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যকালে লেখা এর একখানি পুথিতে সেকালের বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দেবপীঠ ও তীর্থস্থানগুলির নাম ও ছবি আছে। এই সব দেবপীঠের মধ্যে সংখ্যায় লোকনাথের স্থানগুলিই গুরুতর। লোকনাথ-পীঠ ছিল বরেন্দ্রীতে হলদি গ্রামে ও দেদ্দাপুরে; রাঢ়ে—কন্যারাম, রামজাত ও বৈত্রবনা গ্রামে; দণ্ডভুক্তিতে—যজ্ঞপিণ্ডি গ্রামে; সমতটে—জয়তুঙ্গ ও চম্পিতলা গ্রামে; হরিকেলে—"শিলা" লোকনাথ; আর সুবর্ণপুরে—শ্রীবিজয়পুর গ্রামে বা শহরে। বিখ্যাত তারা পীঠ ছিল বরেন্দ্রীতে রাণা গ্রামে ("ইচ্ছা মহত্তারায়ী" বা ইচ্ছা ঠাকুরাণী), রাঢ়ে তাড়িহা গ্রামে, সমতটে বুদ্ধর্দ্ধি গ্রামে (?)[১] আর চন্দ্রদ্বীপে। উল্লেখযোগ্য অপর বৌদ্ধতীর্থ হচ্ছে—

১ অথবা সমতটের বিখ্যাত ঠাকুর ছিল ভগবতী "বুদ্ধর্দ্ধি-তারা"।

পুণ্ড্রবর্ধনে ত্রিশরণ-বুদ্ধ ভট্টারক, তুলাক্ষেত্র গ্রামে বর্ধমানস্তূপ, রাঢ়ে ধর্মরাজিকা চৈত্য ও রাঢ়ে লুতু গ্রামে বজ্রাসন।

এই সব বৌদ্ধ দেবপীঠ অধিকাংশ এখন লুপ্ত হয়েছে। মাটি খুঁড়লে হয়ত মন্দিরের ইট-পাথর পাওয়া যাবে। কতকগুলি আবার শৈব ও শাক্ত দেবপীঠে পরিবর্তিত হয়ে কাল-পরিণাম উপেক্ষা করে এসেছে আজ পর্যন্ত। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, old gods never die, অর্থাৎ প্রাচীন দেবতারা অমর। তারকেশ্বরের কাছে লোকনাথ বোধ হয় এমনিতর ভোল-ফেরানো বৌদ্ধ দেবপীঠ। 'বাজাসন' (<বজ্রাসন); 'ধামরাই' (<ধর্মরাজিক), 'ধামাস' ধর্মাবাস-বাসিক), 'ধামাসিন' (<ধর্মাবাসিনী) প্রভৃতি গ্রামের নাম এখনো লুপ্ত প্রাচীন তীর্থগুলির স্মৃতি বহন করছে।

সেকালের লোকেও স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবতা প্রতিষ্ঠা করত। এখনকার হাওড়া ও চব্বিশ-পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশ প্রাচীন কালে খাড়ী মণ্ডল বলা হত। এই খাড়ী মণ্ডলের অন্তর্গত খসর্পণ গ্রামের ঠাকুর লোকনাথ প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন খসর্পণ-লোকনাথ নামে। এই ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে যে প্রাচীন কিংবদন্তী পাওয়া গেছে তা এখানে বলছি।

এক পুণ্যবান্ ভক্ত উপাসক, নাম শুভঙ্কর, পোতলকে চলেছিলেন। পথে তাঁকে এক রাত কাটাতে হয় খসর্পণ গ্রামে। এখানে রাত্রিতে ভগবান্ অবলোকিতেশ্বর তাঁকে প্রত্যাদেশ দিলেন,—আর যেও না তুমি, এইখানেই আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর, তাতেই তোমার প্রচুর পুণ্য হবে। এই প্রত্যাদেশ পেয়ে শুভঙ্কর অনতিবিলম্বে সেখানে লোকনাথ-মূর্তি স্থাপিত করলেন।

> ইহ শুভঙ্করনামা উপাসকঃ শুভকর্মকারী করুণায়মানঃ স কিল পোতলকগমনোদ্যতঃ গচ্ছন্ খাড়ীমণ্ডলে খসর্পণনামা গ্রামোঽস্তি তত্রোষিতঃ। তস্য তু ভগবতার্য্যাবলোকিতেশ্বরেণ প্রত্যাদেশো দত্তঃ। মা গচ্ছ ত্বমিহাস্মান্ বৈরোচনাভিসংবোধিতন্ত্ররাজক্রমেণ স্থাপয় তেন মহান্

সত্বার্থো ভবিষ্যতি। তত্রাসৌ ভগবন্তং শীঘ্রমেব কারিতবান্ ইত্যেষা শ্রুতিঃ।

দক্ষিণরাঢ়ে ব্রাহ্মণদের স্থিতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক পরিমাণে ছিল বলে দশম শতাব্দী থেকেই রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্য আচার-শৌচ এবং কুল-গর্বের জন্য উত্তরাপথে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ-বিষয়ে ভুরি-শ্রেষ্ঠী বা ভুরশুট (হুগলী-হাওড়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত) অঞ্চলের খ্যাতি ছিল সব চেয়ে বেশি। ভুরশুট-নিবাসী মহাপণ্ডিত ভট্ট শ্রীধর দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বৈশেষিক-দর্শনের প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের একটি মূল্যবান্ টীকা রচনা করেছিলেন ন্যায়কন্দলী নামে। শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন "গুণরত্নাভরণ কায়স্থকুলতিলক" পাণ্ডুদাস। ন্যায়কন্দলীতে শ্রীধর গৌরবের সঙ্গে নিজের জন্মভূমির উল্লেখ করেছেন;

আসীদ্ দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥

সেকালের দাম্ভিক রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণদের উজ্জ্বল ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে। কাশীবাসী ব্রাহ্মণ দম্ভ দূর থেকে অহঙ্কারকে আসতে দেখে অনুমান করছে, নিশ্চয়ই এ দক্ষিণরাঢ়ের লোক:

জ্বলন্নিবাভিমানেন গ্রসন্নিব জগত্রয়ীম্
ভর্ৎসয়ন্নিব বাগ্‌জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব॥

তথা তর্কয়ামি নূনময়ং দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশাদাগতো ভবিষ্যতি।

দম্ভের আশ্রমে ঢুকে যথোচিত অভ্যর্থনার অভাব দেখে অহঙ্কার রুষ্ট হয়ে শিষ্যকে বললে, ম্লেচ্ছদেশে এলুম নাকি:

আঃ পাপতুরুষ্কদেশং প্রাপ্তাঃ স্ম যত্র শ্রোত্রিয়ানতিথানাসনপাদ্যাদিভিরপি গৃহিনো নোপতিষ্ঠন্তি।

অভ্যর্থনা-আদির পর অহঙ্কার আত্মপরিচয় দিচ্ছে,

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি
প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ॥

[শ্রেষ্ঠ রাজ্য গৌড়, তার মধ্যে নিরুপম প্রদেশ রাঢ়াপুরী, সেখানে সুন্দর ভূরিশ্রেষ্ঠক নগরে আমার বাস। আমার পিতা সেখানকার একজন মুখ্য ব্যক্তি। তাঁর মহাকুল পুত্রগণকে এখানে কে না জানে। তাদের মধ্যে আবার প্রজ্ঞাশীল বিবেক ধৈর্য বিনয় এবং আচারে আমি হচ্ছি শ্রেষ্ঠ।]

নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছোত্রিয়ানাং পুন-
র্ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি তাতাধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যত-
স্তৎসম্পর্কবশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্ঝিতা॥

[আমার জননী তেমন সৎকুল থেকে আসেন নি। আমি কিন্তু সৎশ্রোত্রিয় বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেছি। তাতে আমি বাবাকে টেক্কা দিয়েছি। আমার শালার ভাগিনেয়ের কন্যার নামে মিথ্যা-কলঙ্ক রটনা হওয়ায় সেই সম্পর্কের জন্য প্রেয়সী হলেও গৃহিণীকে আমি ত্যাগ করেছি।]

দেবল ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে বামুন দেবপ্রতিমার পূজা করে পেট চালাত তারা ছিল সমাজে নিন্দিত। এদের বলত 'ভোজনক'। এখনো বলে 'ভুজুনে বামুন'।

গুপ্ত-সম্রাট্‌দের শাসনকাল থেকে সেন-বংশের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত সময়ে গৌড় বঙ্গ-মগধের প্রধান প্রধান বিহারগুলিতে এবং অন্যত্র বৌদ্ধ মহাযান-মতের বিশেষ অনুশীলন হত। অভারতীয় ভিক্ষু ও বিদ্যার্থীরা এখানে বাস করে বৌদ্ধ ও

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন। অনেকে এদেশী নামও গ্রহণ করতেন। "চীনদেশবিনির্গত" পুণ্যকীর্তি নামক এক ভিক্ষুর হস্তলিখিত একটি মহাযান-গ্রন্থের পুথি পাওয়া গেছে। পুথিটির লেখা সমাপ্ত হয়েছিল গোপালদেবের ৫৭ রাজ্যাঙ্কে ৯ই ফাল্গুন তারিখে ঘোষলী গ্রামে।

বর্ম-রাজাদের রাজ্যকালে মধ্যবঙ্গের দক্ষিণভাগে মহাযান-মতের বেশ চর্চা ছিল বলে মনে হয়। লঘুকালচক্র নামক মহাযান-গ্রন্থের বিমলপ্রভা নামক টীকার এক পুথির লেখা শেষ হয়েছিল মধ্য বঙ্গে (?) বেঙ্গ নদীর তীরে কোন স্থানে হরিবর্মদেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে ২৯শে আষাঢ় তারিখে। পুথির শেষে ভিন্ন হাতের লেখা তিনটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে সাত বৎসর পরে, হরিবর্মদেবের রাজ্যাঙ্কের ৪৬ বৎসর গত হলে মাঘ মাসের ১১ই তারিখে কৃষ্ণসপ্তমীতে "পূর্বোত্তরদিশাভাগে বেংগনদ্যাস্তথা কূলে" গৌরী নামক কোন মহিলা মৃতা চুঞ্চুকা কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছিল গ্রন্থটি নিয়মিত বাচনের জন্য।

লক্ষ্মণসেনদেবের মৃত্যুর পর যখন উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অধিকার তুর্কি-পাঠানদের হাতে চলে যায় তখনো কিছুকাল ধরে দক্ষিণ মধ্য ও পূর্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে সেন-রাজাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয় নি। সে-সময়েও সেখানে মহাযান-মত চলিত ছিল। সম্ভবত সেন-রাজগণও তখন স্থানীয় ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চরক্ষা নামক মহাযান-গ্রন্থের একটি পুথির পুষ্পিকা থেকে। "পরমেশ্বর-পরমসৌগত-পরমমহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্-গৌড়েশ্বর-মধুসেন-দেবপাদানাং-বিজয়রাজ্যে" ১২১১ শকাব্দে (অর্থাৎ ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) ২রা ভাদ্র তারিখে এই পুথি লেখা শেষ হয়েছিল।

এই সময়ের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মহাযান-মতের বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের এক পুথি লেখা হয়েছিল বেন্নুগ্রামে ১৪৯২ সংবতের ফাল্গুন মাসে (১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে)। সোহিঞ্চরী গ্রাম-নিবাসী সম্পন্ন গৃহস্থ ("কুটুম্বিক") "উচ্চ-মহত্তম" শ্রীমাধব মিত্রের পুত্র "মহত্তম" শ্রীরামদেবের স্বার্থ পরার্থের জন্য "সদ্বৌদ্ধ-করণ-

কায়স্থ-ঠকুর” শ্রীঅমিতাভ এই অনুলিপিখানি করেছিলেন। পরবর্তী কালের হাতের একছত্র লেখা থেকে জানা যায় যে পুথিখানি কোন এক সময়ে গুণকীর্তি “ভিক্ষু-দেবপাদানাং” অধিকারে ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং তাঁর অনুসরণে সকলেই বেনুগ্রামকে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে বেড়ুগ্রাম মনে করেছেন। এই অনুমানের কোন হেতু নাই। বেনুগ্রাম মধ্য বঙ্গে হওয়াই সম্ভবপর মনে করি।

বৌদ্ধ সাহিত্যিকদের লেখা কাব্য ব্রাহ্মণ্য-পন্থীরাও আদর ক'রে পড়ত। বিষ্ণুপাসক ব্রাহ্মণ সর্বানন্দ তাঁর টীকাসর্বস্বে বৌদ্ধ আচার্য মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সুন্দরানন্দচরিত (অর্থাৎ সৌন্দরনন্দ) কাব্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। শেষোক্ত কাব্য এর পূর্বে আর কোন বইয়ে উল্লিখিত হয় নি। এই দুটি কাব্যের যে পুথি নেপালে পাওয়া গেছে তাও যে আদৌ বাংলা দেশ থেকে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

গুপ্ত-সম্রাটদের অধিকারকালে ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বীরা প্রধানত বিষ্ণুর ও তাঁর বিভিন্ন অবতারের মূর্তি এবং শিবলিঙ্গ ও শিবমূর্তি (একক অথবা অর্ধনারীশ্বর বা উমা-মহেশ্বর) প্রতিষ্ঠা করে পূজা করত। সূর্য-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা এবং সূর্য-পূজাও প্রচলিত ছিল। দেবী (চণ্ডী)-প্রতিমা নির্মাণ ও পূজাও অজ্ঞাত ছিল না। বাংলা দেশে যে বৌদ্ধ-মত চলিত ছিল তা মহাযান-সম্প্রদায়ের। তান্ত্রিক মহাযান-মতে বহু দেবদেবীর ও উপদেবতার উপাসনা চলত। এই-সব দেবতার সৌম্য অথবা বীভৎস মূর্তিও তৈরী হত। পাল-বংশের অধিকারকালের শেষভাগ থেকেই এই-সব দেবদেবী ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য-মতের মধ্যে ঢুকতে থাকে। তারা চামুণ্ডা বাসলী ভৈরব ক্ষেত্রপাল গণেশ ইত্যাদি দেবতার পূজা এইভাবেই এসে গেছে। বিশেষ-বিশেষ জাতি বা সঙ্ঘ বিশেষ-বিশেষ দেবতার পূজা-প্রচলনে অগ্রণী হয়েছিল। গণেশের পূজা বোধ হয় বণিক্‌দের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। মহীপালদেবের রাজ্যকালে নির্মিত এক বিনায়ক-মূর্তি সম্প্রতি

ত্রিপুরা জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বণিক্ বুদ্ধমিত্র।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত। পাল ও সেন-বংশের সময়ে নির্মিত বহু প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবী-মূর্তি পাওয়া গেছে। সে-সবই যে পূজার জন্য তৈরি হয়েছিল এমন অনুমান করা চলে না। প্রধানত মন্দির ও প্রাসাদের অলঙ্করণের জন্যই এগুলি গড়া হত, ক্বচিৎ পূজার জন্য। এবিষয়ে প্রমাণ হচ্ছে গোবর্ধন-আচার্যের এই শ্লোক,

পূজা বিনা প্রতিষ্ঠাং নাস্তি ন মন্ত্রং বিনা প্রতিষ্ঠা চ।
তদুভয়বিপ্রতিপন্নং পশ্যতু গীর্বাণপাষাণম্॥

শুধু দেবদেবীর আমদানিতে নয় আরো এক ব্যাপারে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ্য-মত বৌদ্ধ-মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মহাযানের উপাস্য পরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলা দেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন, এবং উত্তরাপথে বাসুদেব-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যেমন ভক্তিপরায়ণ ভাগবত-মত উদ্ভূত হয়েছিল বাংলা দেশে তেমনি লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল। ঐতিহাসিকের চোখে বাংলা দেশে রচিত প্রথম কবিতা হচ্ছে মল্লসারুলে প্রাপ্ত তাম্রপট্টলিপির এই আদি শ্লোকটি যাতে লোকনাথের বন্দনা করা হয়েছে

[জয়তি শ্রী] লোকনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকর্মফলহেতুঃ।
সত্যতপোময়মূর্তির্লোকদ্বয়সাধনো ধর্ম্মঃ॥

এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে গ্রীক বৈষ্ণব হেলিওদোরের বেসনগর গরুড়স্তম্ভ-লিপির এই উক্তি—"তিনি অমৃতপদানি ইঅ সুঅনুঠিতানি নেয়ন্তি স্বগং দম চাগ অপ্রমাদ" [ত্রীণি অমৃতপদানি ইহ স্বনুষ্ঠিতানি নয়ন্তি স্বর্গং দমঃ ত্যাগঃ অপ্রমাদঃ]।

বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও

এই কাহিনীকে অবলম্বন করে তত সহজে ভক্তিধর্মের বিকাশ হয় নি যত সহজে হয়েছিল অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথকে আশ্রয় করে। অবশ্য রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর সঙ্গে ভক্তিধর্মের সংশ্রব যে ছিল না তা বলি না কেননা সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে (১. ৫৮. ৫) তার বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। কুলশেখরের শ্লোক-চারটিও (১. ৬৪. ১-৪) এ-বিষয়ে দ্রষ্টব্য। তবে বৌদ্ধ-মতের ভক্তিভাবের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-কথাশ্রিত বৈষ্ণব ভক্তিভাবের একটু তফাৎ আছে। বৈষ্ণব-মতে ভক্তি জ্ঞান-শূন্য এবং লীলাস্মরণ সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু বৌদ্ধ-মতে ভক্তি জ্ঞানেরই অঙ্গ। বৌদ্ধ ভক্তিবাদ যে কেমন করে শ্রীচৈতন্যের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল তার একটি সুন্দর উদাহরণ পাচ্ছি রামচন্দ্র কবিভারতীর লেখায়। রামচন্দ্র বাঙালী ব্রাহ্মণ। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে সিংহলে গিয়েছিলেন। সেখানে ত্রিপিটকাচার্য রাহুল-পাদের কাছে পালি ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে হীনযান-মত অবলম্বন করেন। সিংহল-রাজ পরাক্রমবাহু এঁকে "বৌদ্ধাগম-চক্রবর্তী" উপাধি দিয়েছিলেন। সেখানে বাস করে রামচন্দ্র কেদারভট্ট লিখিত বৃত্তরত্নাকরের টীকা লেখেন এবং ভক্তিশতক ও বৃত্তমালা বই দুটি রচনা করেন। ভক্তিশতকে এবং বৃত্তরত্নাকরের টীকায় রামচন্দ্র এই আত্মপরিচয় দিয়েছেন,

ভাস্বদ্ভানুকুলাম্বুজন্মমিহিরে রাজাধিরাজেশ্বরে
শ্রীলঙ্কাধিপতৌ পরাক্রমভুজে নীত্যা মহীং শাসতি।
সদ্গৌড়ঃ কবিভারতী ক্ষিতিশূরঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ সুধীঃ
শ্রোতৄণামকরোৎ স ভক্তিশতকং ধর্মার্থমোক্ষপ্রদম্॥
শ্রীমদ্রাহুলপাদতো ত্রিপিটকাচার্যাদ্ গুরোনির্মলং
বৌদ্ধং শাস্ত্রমধীত্য যস্তু শরণং রত্নত্রয়ং শিশ্রিয়ে।
যো বৌদ্ধাগমচক্রবর্তিপদবীং লঙ্কেশ্বরাল্লব্ধবান্
স শ্রীমানিহ সর্বশাস্ত্রনিপুণো ব্যাখ্যামিমাং ব্যাতনোৎ॥

বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হলেও রামচন্দ্রের মনে কিছুমাত্র ধর্মবিদ্বেষ ছিল না। যাঁরা

মনে করেন যে সেকালে বাংলা দেশে বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত তাঁরা ভক্তিশতকের এই শ্লোক থেকে শিক্ষালাভ করবেন,

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচো
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যাহেতুরনন্তসত্ত্বসুখদানল্পা কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্মহে॥

[জ্ঞান যাঁর সমস্ত বস্তু ও বিষয় ব্যাপী, বাক্য যাঁর নির্দোষ, যাঁর চিত্তে অনুরাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি বিকারের লেশ-মাত্র নেই, যাঁর অহেতু অজস্র কৃপামাধুরী অনন্ত জীবের সুখ দান করছে, সেই ভগবানকে আমরা নমস্কার করি—তিনি বুদ্ধই হোন আর গিরিশই হোন।]

ভক্তিশতকের একটি শ্লোকে যেন শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের প্রতিধ্বনি শোনা যায়

মাতেবাসীৎ পরস্ত্রী ভবতি পরধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো
মিথ্যাবাদী ন যঃ স্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ।
মর্যাদাভঙ্গভীরুঃ সকরুণহৃদয়স্ত্যক্তসর্বাভিমানো
ধর্মাত্মা তে স এব প্রভবতি ভগবন্ পাদপূজাং বিধাতুম্॥

[পরস্ত্রী যার কাছে মায়ের মত, যে পুরুষের পরধনে স্পৃহা নেই, যে মিথ্যাবাদী নয়, যে মদ্যপান বা প্রাণিহত্যা করে না, যে মানীর মানভঙ্গ করতে ভীত হয়, যার হৃদয় করুণাপূর্ণ, যে সকল অভিমান ত্যাগ করেছে, হে ভগবন্ সে মহাত্মাই তোমার পা পূজা করবার অধিকার পায়।]

ভক্তিশতকের এই শ্লোকটি শ্রীচৈতন্যের অথবা কোনো গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মহাজনের রচনা বলে চালিয়ে দেওয়া যায় "বুদ্ধ" স্থানে "কৃষ্ণ" বসিয়ে দিলে,

জগদুপকৃতিরেব বুদ্ধপূজা তদপকৃতিস্তব লোকনাথ পীড়া।
জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে গদিতুমহং তব পাদপদ্মভক্তঃ॥

[জগতের উপকার করাই বুদ্ধের পূজা। হে লোকনাথ, জগতের অপকার করাই তোমাকে পীড়া দেওয়া। হে জিন, আমি জগতের অপকারী, তবুও নিজেকে তোমার পাদপদ্মভক্ত বলে প্রচার করতে কেন আমার লজ্জা হচ্ছে না।]

বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভক্তিবাদের যুক্তবেণী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তান্ত্রিক বৈষ্ণব অর্থাৎ বাউল-সহজিয়া ইত্যাদি মতের মধ্যেও তেমনি পূর্বযুগের শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও পূর্বে থেকে বাংলা দেশে বিশেষ করে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের দুটি ধর্ম-মত চলিত ছিল—শৈব নাথ-মত এবং বৌদ্ধ সহজ-মত। এই দুই মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথপন্থী সন্ন্যাসীরা নিজেদের "যোগী" বা "কাপালিক" বলত। এরা কানে নরাস্থিকুণ্ডল কণ্ঠে নরাস্থিমালা পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল ধারণ করত এবং গায়ে ছাই মাখত। এদের আহার-বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাহিরে ছিল এদের কুঁড়ে ঘর। যোগীদের নামের শেষ শব্দ হত "নাথ"। বর্তমান সময়ে জুগী জাতির মধ্যে নাথ পদবী ও পূর্বেকার আচার-অনুষ্ঠানের স্মৃতি কিছু কিছু চলে এসেছে।

সেকশুভোদয়ায় এক যোগীর কাহিনী আছে। গৃহস্থাশ্রমে ইনি ছিলেন গোয়ালা, নাম সুধাকর। যোগী হয়ে নাম হল চন্দ্রনাথ। ইনি লক্ষ্মণসেনের সভায় এলে রাজা এঁকে কিছু আহার করতে অনুরোধ করলেন। রাজার কথায় রাজি হয়ে যোগী চাইলেন অমৃতান্ন। রাজা উত্তম মিষ্টান্ন আনিয়ে দিলে যোগী মুখে তুলে থু থু করে ফেলে দিয়ে বললেন, এ বিষান্ন। রাজা তো অবাক হয়ে রইলেন। তখন চন্দ্রনাথ বললেন, তোমার সভায় কেউ পণ্ডিত থাকে তো তাকে ডাকাও। রাজা গোবর্ধন-আচার্যকে ডাকিয়ে আনলেন। আচার্য শুনে বললেন, এঁকে খুব খারাপ চালের ভাত আর কাল-কচু শাক রেঁধে এনে

দেওয়া হোক। তাই দেওয়া হলে যোগী খুব পরিতৃপ্তি করে তা খেলেন। তখন রাজা বললেন, এ কি রকম ব্যাপার। যোগী উত্তর করলেন, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করলে আমাদের বিষ খাওয়া হয়, আর কদর্য অন্ন খেলে পরিণামে অমৃত-ভক্ষণের ফল হয়।

শৈব ও বৌদ্ধ সহজ-সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী বা অবধূতী অর্থাৎ সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে চর্যাগীতিতে। এই চর্যাগীতিগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাগীতিগুলির আক্ষরিক অর্থ জানা খুব দুরূহ নয়, কিন্তু আসল অর্থ অধিকাংশ স্থানেই অবোধ্য। তবুও যতটুকু বোঝা যায় তার থেকে সহজ-সাধনার গভীরতার আভাস মেলে। নীচজাতির বৃত্তি—যেমন ডালা-চাঙ্গারি বোনা, মদ চোয়ানো, কাঠ কাটা, নৌকা গড়া ও সাঁকো তৈরি, খেয়া বেয়ে বা গুণ টেনে নৌকা চালানো, হাতি পোষা, শীকার করা, জুয়া খেলা তুলো ধোনা, ছদ্মবেশী নটের নৃত্যগীত ইত্যাদি—থেকে নেওয়া উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক আশ্রয় করে কখনো বা প্রচলিত উদ্ভট-হেঁয়ালির যবনিকার অন্তরালে অতি সহজ ভঙ্গিতে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন মীননাথের চর্যাপদে,

কমল বিকসিল কহই ন জমরা
কমল-মধু পিবি ধোকেঁ ন ভ্রমরা।

[কমল ফুটলে শামুককে বলে না, অথচ কমল-মধু পান করতে ভ্রমর কখনো ভুলে না।]

এর সঙ্গে তুলনীয় আধুনিক বাউল-সাধকের উক্তি,

ও সে মত্ত হস্তী টের পেলে না
চেঁউটি মরম জেনেছে।

একটি চর্যায় সেকালের নৌকা-পারাপারের সুন্দর বর্ণনা পাই।

গঙ্গা যমুনা মাঝে রে বহই নাই
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই।
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা
সদগুরু-পাঅপসাএ যাইব পুণু জিণউরা।
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী
গঅণ-দুখোলেঁ সিঞ্চহুঁ পাণী ন পইসই সান্ধি।
চন্দ সুজ্জ দুই চকা সিঠি-সংহার-পুলিন্দা
বাম দাহিন দুই মাগ ন চেবই বাহ তু ছন্দা।
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই
জো রথে চড়িলা বহিবান জোই কূলে কূলঁ বুলই॥

[গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা বাইছে; তাতে চণ্ডাল-কন্যা ডুবে ডুবে হেলায় যোগীদের পার করছে। ডোমনী, তুই নৌকা বা লো বা, পথে বেলা হয়ে গেল; সদ্‌গুরুর পাদপ্রসাদে জিনপুর যেতে হবে। নৌকার সামনের দিকে পাঁচ কেরোয়াল পড়ছে, পিছনে কাছি বাঁধা। গগন-রূপ সেঁউতি দিয়ে সেঁচ, যাতে ফাঁক দিয়ে জল না ঢুকতে পারে। চন্দ্রসূর্য দুই চাকা সৃষ্টি ও সংহারের "গুণরুকৃথ" বা মাস্তুল। বামে ও ডাইনে পথ দেখা যাচ্ছে না, তুই স্বচ্ছন্দে নৌকা বা। কড়িও নেয় না বুড়িও নেয় না, সহজে পার করে দেয়। যে বহিরঙ্গ যোগী রথে চড়লে সে কেবল কূলে কূলে ঘুরতে লাগল।]

চর্যাগীতিগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরূপ। পদাবলীর মত এতেও রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে এবং কবির ভনিতা আছে। ভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধকদের রাগাত্মিক-পদের সঙ্গে চর্যাপদের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

চর্যাগীতির মধ্যে দিয়ে সেকালের সাধারণ এবং দরিদ্র-জীবনের যে খণ্ড চিত্র উঁকি দেয় তা অন্যত্র অপ্রাপ্য। তখনও দরিদ্র বাঙালীর "হাঁড়িত ভাত নাহি" অথচ অতিথির কামাই নেই। বিবাহে যৌতুকের প্রাধান্য কিছু কম ছিল না, এবং বরও বিয়ে করতে যেত বাজনা-বাদ্য করে।[১] বাংলা দেশের যে অংশ তখন "বঙ্গ" বা "বঙ্গাল" নামে প্রসিদ্ধ ছিল সেই নিম্নবঙ্গে প্রধানত দরিদ্র ও নীচজাতির লোকেরই বাস ছিল। তাই সেদেশের মেয়ে বিয়ে করা নিন্দনীয় ছিল, এমন কি সে-জন্য জাতিচ্যুত হতেও হত।

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভৈলি
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলি।

[ভুসুকু, আজ তুই বাঙালী হলি। তুই চণ্ডালীকে নিজের গৃহিণী করলি।]

৬

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতেই অনেকগুলি পুরানো ধর্মোৎসব লোপ পেয়ে আসছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে শক্রধ্বজোত্থান। সেকালে সাধারণত ধনী বণিকেরাই শক্রধ্বজ প্রতিষ্ঠা করত। কবি গোবর্ধন-আচার্য দুঃখ করে বলেছেন,

তে শ্রেষ্ঠিনঃ ক্ব সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢ়িং বাধুনাতনাস্ত্বাং বিধিৎসন্তি॥

[হে শক্রধ্বজ, সম্প্রতি কোথায় সেই শ্রেষ্ঠীরা যারা তোমাকে উন্নত করে গিয়েছিল। এখনকার লোকে তোমাকে লাঙ্গলের ইষ অথবা গোরু বাঁধবার গোঁজ করতে চায়।]

বাংলা দেশের অভ্যন্তরে অনুন্নত পল্লী অঞ্চলে কোথাও কোথাও এখনো পথে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে গাছতলায়-পুকুরের পাড়ে খেত-খামারে নানারকম অপৌরাণিক লৌকিক দেবদেবীর পূজা চলিত আছে। ক্ষেত্রপাল কালিয়া-দানা হেঁটালচণ্ডী নেকড়াই-চণ্ডী ঝাকড়াই-চণ্ডী ফেঁতাই-চণ্ডী দিদি-ঠাকরুণ

১ চর্যাগীতি ১৯ দ্রষ্টব্য।

সন্ন্যাসী-ঠাকুর ইত্যাদি এইজাতীয় দেবতা। যে-কালের কথা বলছি সে-কালেও গ্রামের উপান্তে বৃক্ষতলে দেবতা-উপদেবতার পূজা জনসাধারণের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল না। গোবর্ধন-আচার্য লিখেছেন,

ত্বয়ি কুগ্রামবটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বসতু বা লক্ষ্মীঃ।
পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা ॥

[হে কুগ্রামের বটদ্রুম, তোমাতে কুবেরের অথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাক বা না থাক, মূর্খ গ্রামীণ লোকের কুঠারাঘাত থেকে তোমার রক্ষা হয় শুধু মহিষের শৃঙ্গতাড়নায়।]

সমাজের নিম্নস্তরে তখন অনার্য-প্রথামত স্থানীয় দেবদেবী-উপদেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ কোনো কোনো দেবদেবী-স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলেই এই পীঠস্থানের অধিক প্রাদুর্ভাব। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে এইরকম গ্রাম্যপূজার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে,

তৈস্তৈর্জীবোপহারৈর্গিরিকুহরশিলাসংশ্রয়ামর্চয়িত্বা
দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্ত্বা।
তুম্বীবীণাবিনোদব্যবহৃতসরকামহ্নি জীর্ণে পুরাণীং
হালাং মালূরকোষৈর্যুবতিসহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি ॥

[নানাবিধ জীব বলি দিয়ে দেবী বনদুর্গাকে পূজা করে, গাছের তলায় ক্ষেত্রপালকে রক্ত দিয়ে দিনশেষে বর্বর লোকেরা তাদের সহচরীদের নিয়ে একতারা বাজিয়ে নাচগান করতে করতে বেলের খোলায় মদ্যপান করছে।]

বাংলা দেশের একটি নিজস্ব দেবতার পূজাপদ্ধতিতে বৈদিক ও পৌরাণিক আর্য ও অনার্য উভয় পদ্ধতির সমাবেশ হয়েছিল। ইনি ধর্ম-ঠাকুর। এককালে এঁর পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চলিত ছিল, পরে ভাগীরথীর দক্ষিণ ও পশ্চিম

কূল-বেষ্টিত রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এখন বর্ধমান বিভাগের বাইরে ধর্মপূজা বড় দেখা যায় না। অনেকগুলি আর্য ও অনার্য দেবতা মিলে ধর্ম-ঠাকুর হয়েছেন। বৈদিক বরুণ (আকাশ ও জল-দেবতা) ও রথারোহী সূর্য, অবৈদিক কূর্মাবতার, ঈরানীয় বুটপরা ঘোড়াচড়া সিপাহী মিহির, ভবিষ্য বা পৌরাণিক কল্কি-অবতার এবং অনার্য পাষাণ-খণ্ড, তাম্রধাতু ও বৃক্ষ-দেবতা—এই-সব মিলে বাংলায় ধর্ম-ঠাকুরের উদ্ভব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম-ঠাকুরের পরিচয় দিতে গিয়ে এঁকে বৌদ্ধ-মতের ধর্ম বলে স্থির করেছিলেন এবং ধর্ম-ঠাকুরের প্রতীককে বৌদ্ধ চৈত্যের রূপান্তর মনে করেছিলেন। সেই থেকে সকলে ধর্ম-পূজাকে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি বলেই ধরে আসছেন। কিন্তু এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। ধর্ম নামটি বৌদ্ধ ধর্ম থেকে গৃহীত হতে পারে, কেননা বাংলা দেশে মহাযান মতে লোকনাথ ও ধর্ম অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অথবা শব্দটি কোন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপও হতে পারে। ধর্ম-ঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে। এই শূন্য বৌদ্ধ মহাযান-মতের শূন্য নয়। এখানে শূন্য মানে নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র। ধর্ম-দেবতা নিষ্কলঙ্ক সর্বশ্বেত, তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে শাদা পেঁচা বা শাদা কাক। রূপকচ্ছলে ধর্ম-ঠাকুরকে শাদা হাঁস কল্পনা করা হয়েছে। সিপাহী-মূর্তিতেও তাঁর বাহন শ্বেত অশ্ব। ধর্ম-পূজার মন্ত্রে সূর্যকে "নিরঞ্জন" "শূন্যদেহ" বলা হয়েছে। ধর্ম-ঠাকুরের প্রতীক যা পূজা করা হত তা হচ্ছে কূর্মাকৃতি পাষাণখণ্ড অথবা ধাতু বা পাষাণনির্মিত কূর্ম-বিগ্রহ। কূর্ম-প্রতিমার পৃষ্ঠে সাধারণত ধর্ম-ঠাকুরের পাদুকা-চিহ্ন আঁকা থাকত। এই পাদুকাচিহ্নই ধর্ম-ঠাকুরের আসল প্রতীক। ধর্ম-পণ্ডিত অর্থাৎ ধর্ম-পূজার যাঁরা পুরোহিত তাঁরা সর্বদা গলায় ধর্মের পাদুকা ঝুলিয়ে রাখতেন। এই প্রথা নাথ-পন্থীরাও গ্রহণ করেছিল।

ধর্ম ছিলেন সেকালে যোদ্ধা ডোম-জাতির দেবতা, তাই ডোমেরাই ধর্ম-পূজার প্রধান অধিকারী ছিল। এখন কৈবর্ত বাগদি ধোপা শুঁড়ি ইত্যাদি নানা

জাতের ধর্ম-পণ্ডিত দেখা যায়। যেখানে ধর্ম-ঠাকুর শিব বা বিষ্ণু হয়ে গেছেন সেখানে পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছে ব্রাহ্মণে। ধর্ম-ঠাকুরের আদিম পূজায় মদ্য মাংস পিষ্টক ইত্যাদি রাশীকৃত নৈবেদ্য ("মদ্যের পুষ্করণী দিব পিষ্টের জাঙ্গাল") এবং শূকর বলি দেওয়া হত। এখন সচরাচর হাঁস পায়রা ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। কচিৎ গাজনের সময় ধর্ম-ঠাকুরকে মদে স্নান করায় এবং শূকর বলি দেয়। নৈবেদ্যে গুড়পিঠাও দেওয়া হয়। ধর্মের গাজনে দেয়াসিরা মুখোস পরে মৃতদেহ ও মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্যগীত করত। উত্তররাঢ়ের কোনো কোনো স্থানে এ প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। এই নাচকে বলত "পাতা-নাচ" অর্থাৎ পাত্র-নৃত্য। ধর্ম-ঠাকুরের এইরকম পূজাকে লক্ষ্য ক'রেই বোধ হয় বৃন্দাবন দাস লিখেছিলেন, "মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।"

সেকালে নৃত্যগীত ছিল দেবপূজার অঙ্গ। বিষ্ণুর ও শিবের দেউলে দেবদাসীর বা দেয়াসিনীর নাচ গান হত। দক্ষিণরাঢ়ে সেন-রাজাদের কুলদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের উল্লেখ করে ধোয়ী বলেছেন,

অস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃৎ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্বতে বাররামাঃ॥

[সেই সুহ্মদেশে সেন-বংশীয় ভূপতি কর্তৃক দেবরাজ্যে অভিষিক্ত কমলাপতি দেব মুরারি বাস করছেন, যাঁর কাছে সর্বদা লীলাকমলধারিণী স্বভাবসুন্দর বারনারীরা অবস্থান করে লোকের মনে লক্ষ্মী ভ্রম উৎপাদন করে।]

দুর্গাপূজায় অষ্টমীর রাত্রে পূজার অঙ্গ হিসাবে নাচ-গান ছড়া কাটাকাটি হত। পরে এই প্রথা শুধু ধর্মের গাজনেই রয়ে যায়। ধর্ম-ঠাকুরের প্রধান পূজা ছিল "ঘরভরা" বা "গৃহাভরণ" গাজন—পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। এই গাজন-উৎসবের একটা

প্রধান অঙ্গ ছিল "কালিকা-পাতা" বা "কালী-কাচ" নাচ অর্থাৎ কালী-বেশে নৃমুণ্ড-হাতে নৃত্য।

ধর্মের গাজনের অঙ্গরূপে বাংলা দেশের প্রায় সব দেবদেবী এমন কি প্রাচীন কৃষির ও অন্যান্য জীবিকাবৃত্তির প্রতিনিধি দেবতারাও পূজাভাগ গ্রহণ করেছে। আখবাড়ীর ও আখমাড়াই-কলের দেবতা নাম নিয়েছেন পণ্ডাসুর (পুণ্ড্রাসুর)। এঁর মন্ত্র হচ্ছে,

পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুযন্ত্রেস্থং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥
পণ্ডাসুর নমস্তভ্যমিক্ষুবাটিনিবাসিনে।
যজমানহিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে॥

পশ্চিমবঙ্গে পণ্ডাসুরের পূজা এখনও লোপ পায় নি। আখবাড়ীতে আখের ডগা বসাবার পূর্বে যে "পরাশর" বা "পড়াসর"-এর পূজা হয় তিনিই এই পণ্ডাসুর।

ধর্ম-পূজার মধ্যে জাগুলীর অর্থাৎ সর্পদেবী মনসার পূজার বিধান আছে। মনসা-পূজা কখন থেকে বাংলা দেশে ভদ্রসমাজে প্রচলিত হয়েছে তা ঠিক করবার উপায় নেই। একাদশ শতাব্দীর আগেই বৌদ্ধ মহাযান-মতের তান্ত্রিক-সাধনায় ইনি ঢুকেছিলেন 'জাঙ্গুলী' বা 'আর্য-জাঙ্গুলী' রূপে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর স্থাপত্যশিল্পে মনসার মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তা পূজার জন্য বলে মনে হয় না। তবে সেকালের রাজসভায় "জাঙ্গলিক" বা "গারুড়িক" অর্থাৎ বিষবৈদ্য সম্মানের স্থান পেত। লোকে সাপখেলানো খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখত। উমাপতিধরের একটি শ্লোকে এ-বিষয়ের বর্ণনা আছে ;

ক্ষুদ্রাস্তে ভুজগাঃ শিরাংসি নময়ত্যাদায় যেষামিদং
ভ্রাতর্জাঙ্গলিক ত্বদাননমিলন্মন্ত্রানুবিদ্ধং রজঃ।
জীর্ণস্তেষ ফণী ন যস্য কিমপি ত্বাদৃগগুণীন্দ্রব্রজা-
কীর্ণক্ষ্মাতলধাবনাদপি ভজত্যানম্রভাবং শিরঃ॥

[ভাই সাপুড়ে, তোমার এই সাপগুলি ছোট, তোমার মুখের ফুঁ-দেওয়া ধূলি এদের মাথা নুইয়ে দিচ্ছে। এই ফণাধারী সাপটি বোধ হয় প্রবীণ, কেননা তোমার মত গুনিনদের দ্বারা পূর্ণ মাটিতে দ্রুত ধাবন করেও এর মাথা নত হচ্ছে না।]

গোবর্ধন-আচার্য লিখেছেন,

কিং পরজীবৈর্দীব্যসি বিস্ময়মধুরাক্ষি গচ্ছ সখি দূরম্।
অহিমধিচত্বরমুরগগ্রাহী খেলয়তু নির্বিঘ্নঃ॥

[হে সখি, সাপ-খেলা দেখতে দেখতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে মধুরতর হয়েছে। অতএব কেন পরের জীবনকে বিপদাপন্ন করছ। দূরে সরে যাও, প্রাঙ্গণে সাপুড়ে নির্বিঘ্নে সাপ খেলাক।]

বেদেরা সাপ-খেলা দেখিয়ে ভিক্ষা করত। সর্বানন্দ বলেছেন,

"ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে।"

আর যারা সাপ ধরত তাদের তখনো বলত 'মাল'।

উচ্চবর্ণের মধ্যে রামের বা রাম-সীতার মূর্তি-পূজার প্রচলন ছিল। এখন এ পূজা একরকম উঠে গেছে বললেই হয়। পবনদূতে ধোয়ী "স্বর্ণদী" বা ভাগীরথী তীরে "রঘুকুলগুরু" দেবতার উল্লেখ করেছেন। বাংলা দেশে রামায়ণ-কাহিনীর চর্চা আবহমান কাল থেকে আছে। এদেশে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু বিশিষ্টতাও আছে, যেমন হনুমান অথবা রাম কর্তৃক দুর্গাপূজা। বাংলা দেশে প্রাচীন কালে দুইখানি রামচরিত কাব্য লেখা হয়েছিল। একখানির লেখক দেবপাল-দেবের অনুগৃহীত কবি অভিনন্দ, অপরখানির রচয়িতা হচ্ছেন রামপালদেবের মহাসান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতিনন্দীর পুত্র পৌণ্ডবর্ধনপুর-বাসী "কলিকালবাল্মীকি" সন্ধ্যাকরনন্দী। সন্ধ্যাকরনন্দীর কাব্যে দ্ব্যর্থে এক পক্ষে রামচন্দ্রের কাহিনী অপর পক্ষে রামপালদেবের ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

৭

গুপ্ত-সম্রাট্‌দের সময়ের পূর্ব থেকেই বাংলা দেশে সংস্কৃতকাব্য ও শাস্ত্র-চর্চার পত্তন হয়েছিল। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এদেশের রচনারীতির বিশিষ্টতা আর্যাবর্তে স্বীকৃত হয়েছিল "গৌড়ী রীতি" নামে। শব্দের আড়ম্বর এবং অনুপ্রাসের প্রাচুর্য এই রীতির প্রধান লক্ষণ। বেদের আলোচনা খুব বেশি না হলেও একেবারে যে হত না একথা বলা চলে না। ব্যাকরণের ও অভিধানের চর্চায় বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় হীন ছিল না। দর্শনের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনের আলোচনাই ছিল প্রধান। বেদান্ত দর্শনের তেমন আদর ছিল না। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দ্বিতীয় অঙ্কে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ অহঙ্কার কাশীতে বেদান্ত-চর্চার বাহুল্য দেখে অবজ্ঞা করে বলছে,

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধবিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ।
বেদান্তাঃ যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে ॥

[প্রত্যক্ষ আদি প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ বিরুদ্ধ-অর্থজ্ঞাপক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয় তবে বৌদ্ধেরা কি অপরাধ করলে।]

আর্যাবর্তের প্রান্তীয় দেশ বলে বাংলায় স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুশীলন প্রখর ছিল। তারপর তুর্কি অধিকার-কাল থেকে স্মৃতি-শাস্ত্রের মর্যাদা ও চর্চা খুবই বেড়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় সুলতান জালালুদ্দীন-যদুর সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী বৃহস্পতি মিশ্র যে স্মৃতির বই লিখেছিলেন তাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে বর্ণান্তর থেকে স্ত্রী-গ্রহণ স্বীকৃত হয়েছিল।

আয়ুর্বেদের আলোচনাও খুব হত। আয়ুর্বেদের অনেক ভাল ভাল বই বাংলা দেশে লেখা হয়েছিল। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য উভয়-মতাবলম্বীরা এবিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। আয়ুর্বেদের একখানি ভাল বই হচ্ছে চক্রদত্ত। এটির রচয়িতা চক্রপাণি-দত্তের পিতা নারায়ণ নয়পালদেবের সভাসদ্ ছিলেন। চক্রদত্তের টীকাকার নিশ্চলকর বৌদ্ধ-তন্ত্রের অনুসারে দৈবচিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছেন। গোবর্ধন-আচার্যের কাব্যে পালাজরের দৈব-ঔষধের উল্লেখ আছে।

অপনীতনিখিলতাপাং সুভগ স্বকরেণ বিনিহিতাং ভবতা।
পতিশয়নবারপালিজ্বরৌষধং বহতি সা মালাম্ ॥

রাজার নিজস্ব চিকিৎসকের উপাধি ছিল "অন্তরঙ্গ"। মুসলমান সুলতানেরাও হিন্দু অন্তরঙ্গ নিযুক্ত করতেন। চক্রদত্তের এক টীকাকার শিবদাস সেনের পিতা অনন্ত সেন রুকনুদ্দীন বার্বক শাহার অন্তরঙ্গ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পারিষদ শ্রীখণ্ড-বাসী মুকুন্দ সরকার ছিলেন হোসেন শাহার "অন্তরঙ্গ"।

৮

সেকালের রণকৌশলের বা যুদ্ধযাত্রার কোনো সমসাময়িক বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় নি। পুরানো বাংলা কাব্যে যে যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় তা যাত্রার যুদ্ধ। তবে কোনো কোনো ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধযাত্রা-বর্ণনা বাস্তবমিশ্র বলে মনে হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি যে-অঞ্চলে লেখা হয়েছিল সেখানে মুসলমান-আধিপত্য সত্ত্বেও স্থানীয় জমিদারেরা অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করত এবং সৈন্যসামন্ত ও লাঠিয়াল পুষত। বন্দ্যঘটীয় (অর্থাৎ বাঁড়ুজ্জে) আর্তিহরের পুত্র সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে (১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ) ঘোড়ার বিভিন্ন রকম দৌড়ের বাংলা নাম দেওয়া আছে। যেমন, 'পর' ("ত্বরয়া সাম্যেন গতিঃ"), 'বীরব' ("বিষ্টব্ধা সমা চ গতিঃ"), 'পুলিন' ("ঋজুদূরগমনং"), 'হ্রেডু' ("মণ্ডলিকালয়েন গমনং") এবং 'মার্জা' ("বেগেন বিক্ষিপ্তোপরিচরণং")। বাঙালী তখনো যুদ্ধবিদ্যা ভোলেনি। মহানবমীর দিনে রাজা ও প্রজারা শান্তিজল নিত, একথাও সর্বানন্দ লিখে গেছেন।

যুদ্ধে অথবা চাষবাসে ও গার্হস্থ্য কার্যে বেগার ধরা হত, তাকে বলত 'বেঠ' (সংস্কৃত 'বিষ্টি')। রাষ্ট্রবিপ্লব বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ 'চাটক' নামে খ্যাত ছিল। চতুরঙ্গ বল নিয়ে যুদ্ধে অভিযান করলে বলত 'সব্বপল্লাণ'।

৯

প্রাচীনকালে নৃত্যগীত-চর্চায় কবি-পণ্ডিতেরাও বিমুখ ছিলেন না। যাঁরা নট-বৃত্তি করতেন তাঁদেরও সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিল। নট গাঙ্গো (গাঙ্গোক) রচিত কয়েকটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত রক্ষিত হয়েছে। স্বয়ং জয়দেব সঙ্গীতকলায় পারঙ্গম ছিলেন। এঁর পত্নী পদ্মাবতীও নৃত্যগীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠা ছিলেন। সেক-শুভোদয়ায় আছে, একদা লক্ষ্মণসেনদেবের সভায় নাচ-গান হচ্ছিল। গায়িকা ছিল গাঙ্গো নটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা। বিদ্যুৎপ্রভা সুহই রাগ আলাপ করছিল। তখন এক বণিক্‌বধূ ছেলে নিয়ে রাজবাড়ির কাছে কুয়ায় জল তুলতে এসেছিল। বিদ্যুৎপ্রভার গানে মুগ্ধ হয়ে সে কুয়ায় কলসী না নামিয়ে ছেলের গলায় দড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল। বিদ্যুৎপ্রভার গান শেষ হলে উড়িষ্যা থেকে আগত দিগ্‌বিজয়ী গায়ন বুঢ়ন-মিশ্র আলাপ করলেন পঠমঞ্জরী রাগ। গান যখন শেষ হল তখন দেখা গেল, কাছে যে পিপ্পল বৃক্ষ ছিল তার সব পাতা ঝরে গেছে। সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল। রাজাও তাকে জয়পত্র দিতে উদ্যত হয়েছেন এমন সময় জয়দেব-মিশ্রের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরছিলেন, শব্দ শুনে সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি ব্যাপার শুনে বললেন, আমি ও আমার কবীন্দ্র স্বামী বর্তমান থাকতে জয়পত্র নিয়ে যেতে পারে এমন শক্তি কার আছে। যার সে সাহস আছে সে আমাদের সঙ্গে এসে গীত-রস বা শাস্ত্র নিয়ে বিচার করুক। আমার স্বামীকে খবর দেওয়া হোক, তিনি এলে হয় আমার সঙ্গে নয় তাঁর সঙ্গে বিচার হোক। শেখ বললেন, তোমার স্বামীর গুণ পরে বোঝা যাবে, তুমি এখন একটি রাগ আলাপ কর দেখি। পদ্মাবতী গান্ধার রাগ গাইলেন আর অমনি গঙ্গায় দূরে যেসব নৌকা ছিল সেগুলি ধ্বনির আকর্ষণে নিকটে চলে এল। সভাসদ্ সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল, বললে, দুজনের মধ্যে ব্রাহ্মণীই শ্রেষ্ঠ, কেননা নির্জীব নৌকা গান শুনে চলে এসেছে, গাছের পাতা তো সজীব। বেগতিক বুঝে বুঢ়ন-মিশ্র ব্যঙ্গ করে বলে বসলেন, স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিচারে আমি রাজি নই,

দেখছি আপনাদের দেশে স্ত্রীলোকই বহুগুণ আর পুরুষ নির্গুণ। এই কথা শুনে পদ্মাবতী দাসী পাঠিয়ে দিলেন জয়দেব-মিশ্রকে আনতে। মিশ্র এসে শুনে বললেন, আপনারা কিসের অপেক্ষা করছেন; আমার স্ত্রীই তো জিতেছে। তখন শেখ বললেন, দু'জনেই গুণবান্ বটে, এখন আপনার গুণ দেখা যাক। এঁর রাগ-আলাপ শুনে বৃক্ষ নিষ্পত্র হয়েছে, তা বেশ। কিন্তু তাতে এমন কি বাহাদুরি; বসন্তকালে তো এমনিই গাছের পাতা ঝরে পড়ে। শেখ বললেন, তা ঠিক, কিন্তু একদিনেই তো সব পাতা প'ড়ে যায় না, দিনে দিনে পড়ে। তখন জয়দেব বললেন, বেশ, তা হ'লে উনি গান করুন, নিষ্পত্র বৃক্ষ সপত্র হোক। বুঢ়ন-মিশ্র বললেন, তা আমি পারব না, আপনি পারেন যদি দেখিয়ে দিন। মিশ্র বললেন, বেশ তা হ'লে স্বীকার করুন, যে বৃক্ষকে সপত্র করতে পারবে সেই জিতবে। বুঢ়ন-মিশ্র রাজি হলেন এবং সকলে সে-প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তারপর জয়দেব-মিশ্র বসন্ত রাগ আলাপ শুরু করলেন আর দেখতে দেখতে গাছে কমনীয় নবপত্র গজিয়ে উঠতে লাগল। গানও যেমনি শেষ হল বৃক্ষটিও সম্পূর্ণ সপত্র রূপ ধারণ করলে। সভায় জয়ধ্বনি উঠল।

জয়দেবের পত্নী প্রথমজীবনে দেবদাসী নটী ছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে। "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী"—জয়দেবের এই উক্তি থেকে অনেকে অনুমান করে থাকেন যে গীতগোবিন্দ গাইবার জন্য জয়দেবের দল ছিল। সেই দলে পদ্মাবতী নাচতেন ও গাইতেন আর জয়দেব মৃদঙ্গ বাজাতেন অথবা দোহারের কাজ করতেন। তখনকার দিনে নাটগীতে গান করত পুরুষে আর নাচ করত মেয়েতে। এর বিপর্যয় হত না বলেই চর্যাগীতিকার কবি বলেছেন,

নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি সেঙ্গ, বুদ্ধনাটক বিষমা হোই।

[বাজিল নাচছেন আর দেবী গাইছেন; বুদ্ধের নাট হয় বিষম।]

গীতগোবিন্দের পদগুলিতে সেকালের নৃত্যগীত বা নাটযাত্রা পালার নিদর্শন পাচ্ছি। সেকালের দেবলীলা-নাটগীত অনেক সময় দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে

শোভাযাত্রায় হত বলে একে বলত যাত্রা। আর গোড়ার দিকে পুতুল-নাচের সঙ্গে হত বলে এর সাধারণ নাম হয়েছিল 'পাঁচালি'। পাঁচালি শব্দটি এসেছে 'পঞ্চালিকা' শব্দ থেকে। পঞ্চালিকা মানে পুতুল। মনে হয়, প্রথমে এই ধরণের পুতুল নাচের চলন ছিল পঞ্চাল দেশে। সেইজন্য পঞ্চালিকা নাম হয়। কোষকার অমরসিংহের সময়ে পঞ্চালিকার প্রধান উপাদান ছিল বস্ত্র ও হাতির দাঁত। সর্ব্বানন্দের সময়ে বাংলাদেশে কাঠ ও জন্তুর শিঙও ব্যবহার হত।

পাঁচালি নাটগীতের প্রাচীনরূপ কেমন ছিল সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত পেয়েছি বাংলা দেশে সঙ্কলিত একটি পুরাণ গ্রন্থে। বৃহৎ-ধর্মপুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিষ্ণুসভায় শিবের গান উপলক্ষ্যে আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দ-গানের যেন সমসাময়িক বর্ণনা পাচ্ছি :

বিষ্ণুর সভায় দেবতা ও ঋষিরা সমবেত হলে বিষ্ণুর অনুরোধে শিব গান জুড়লেন। নারদ হলেন তাঁর দোহার। প্রথমে গান্ধার রাগ আলাপ করতেই কৃষ্ণের মত সাজানো গান্ধাররাগের মূর্তি আবির্ভূত হল সিংহাসনের উপর। তখন শিব গান ধরলেন,—দূতী কৃষ্ণের কাছে রাধার সঙ্কেতবার্তা এনেছে,

কেশব কমলমুখীমুখকমলম্।
কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্॥
কুঞ্জগেহে বিজনে হৃতি বিমলম্॥ ধ্রু॥
সুরুচিরহেমলতানবলম্বা তরুণতরুং ভগবন্তম্।
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমন্থকলয়তি সা তু ভবন্তম্॥

গান ধরবার সঙ্গে সঙ্গে দূতীর মূর্তি দেখা দিলে বিষ্ণু অনিমেষ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে রইলেন; ব্রহ্মার চার মাথাই ঘুরে গেল; আর সকলে চিত্রাপিতের মত স্তব্ধ।

তারপর শিব তান ধরলেন শ্রী-রাগিণীর। অমনি দূতীর মূর্তি সরে গিয়ে

সাক্ষাৎ শ্রী-রাগিণীর মত রাধার মূর্তি হাজির হল কৃষ্ণ মূর্তির কাছ ঘেঁষে। অমনি শিব ধুয়া ধরলেন রাধার উক্তি,

রসিকেশ কেশব হে।
রসসরসীমিব মামুপযোজয়
রসময় রসনিবহে ॥

ভাবতন্ময় বিষ্ণু তখন শিবকে আলিঙ্গন করে দ্রবীভূত হয়ে গেলেন।

পরবর্তী কালেও কৃষ্ণলীলার, বিশেষত রাধাবিরহ-ঘটিত গান নটীদের প্রধান অবলম্বন ছিল। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে এইরূপ "তাণ্ডব" বা নটী-নৃত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে ঃ

সনকা নটিনী নাম গৌড়-নিবাসী
দেবকন্যা সমতুল্য সাক্ষাৎ উর্ব্বশী।
চিন্তামণি পরিপাটী বেউশ্যার ঠাট
রাজদরবারে গিয়া উসারিল নাট।
আগু হয়ে বায়েন মাদলে দিল ঘা
মেয়েদের ধাওয়াধাই নটী নাচে বা।
আচম্বিতে আরম্ভিল অনন্ত জরপ
সভামধ্যে নৃত্য করে বয়স অল্প।
সনকা বেউশ্যা নাচে নৃপতির মাঝে
ঘন ঘন সঘনে ঘুঙ্গুর বাদ্য বাজে।
তাধিনিতা ধিনি ধিনি বাজয়ে মাদল
মৃদঙ্গ মন্দিরা শব্দ উঠে সুসরল।
রুনু ঝুনু চরণে নূপুর ঘন চলে
ঝন ঝন করতাল মকরন্দ বোলে।

ডাকে পাকে চলন বলন সাবধান
শূন্য ভরে উঠে বৈসে রাখে পঞ্চতান।
কোকিল-মধুর ভাষে মনোহর গীত
রাধার মহিম গায় রাধার চরিত।
নাট-গীতে মোহিত করিল সভাজন
রূপ দেখি মরমে ভুলিল ভূঞাগণ।
দেবতা-সমাজে যেন নাচে বিদ্যাধরী
আনন্দে মোহিত সভে বলে হরি হরি।
বেউশ্যার রূপে সভা মোহিত হইল
অঙ্গের কাবাই রাজা বক্সিস করিল।
পানের বাটায় ছিল পঞ্চাশ মোহর
বেউশ্যার হাথে হাথে দিল গৌড়েশ্বর।
রাজা দিল বক্সিস দেখিল ভুঞাগণ।
লালবান্ধা জরি দিল হাসন হুসন।
বারভুঞা চৌদিকে অনেক ধন দিল
সনকার রূপ দেখ্যা নৃপতি ভুলিল।

'সবরসিআ' ছিল সপ্ততন্ত্রী বীণা। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বাংশি' (বাঁশি), 'কাণ্ড' (কাড়া), 'কাহল', 'কিন্দরা' ("চণ্ডালবীণা"—একতারা?), 'মড্ডু' বা 'চুচুক' (বড় ডমরু), 'ডমরুলি' (ছোট ডমরু), 'ডেঙ্গুরী' ("ডিণ্ডিম"), 'হুড়ুক্ক' ("পণব"), 'দুন্দুহি' (ঢাক)। বংশীবাদককে বলত 'বাংশিআর'। মিলিতকণ্ঠে জয়গানের নাম ছিল 'বাবেহা'।

জুয়াখেলাও তখনকার দিনে অজানিত ছিল না। জুয়ার বাজিকে বলত 'অড্ঢ' বা 'আঢ', আড্ডাধারীকে বলত 'সহিআর'। মেড়ার ও মুরগীর লড়াইয়েও বাজি রাখা হত। একথা সর্বানন্দের উক্তি থেকে জানা যায়।

১০

ষোড়শ শতাব্দীর কোনো কোনো কাব্যে সমসাময়িক বাঙালীর ভোজন-বিলাসিতার বিস্মৃত বর্ণনা আছে। পূর্ববর্তী কালের এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবুও একটু আধটু যা জানা যায় তাতে মনে হয় যে ভোজন-ব্যাপারে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য অনেককাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ভাত এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য দই, ঘি, ক্ষীর, ছানা অবস্থাপন্ন বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল। মৎস্য-মাংসের প্রচলন ছিল ব্রাহ্মণেতর সমাজে বেশি করে। 'খাজা' (<খাদ্য, মুড়মুড়ে মিষ্টান্ন), 'মোয়া' (<মোদক, নরম মিষ্টান্ন), 'নাড়ু' (<লড্ডুক, শক্ত মিষ্টান্ন), 'খাড়' (<খণ্ড, পাটালি নবাত জাতীয় গুড়ের বা চিনির শক্ত মিষ্টান্ন), 'পিঠা' (<পিষ্টক, চালগুঁড়া ও গুড় মিশ্রিত ভাজা মিষ্টান্ন), 'ফেনি' (<ফাণিত, বাতাসা), 'কদমা' (<কদম্ব, কদম ফুলের আকারের চিনির মিষ্টান্ন), 'দুধশাকর' (<দুগ্ধশর্করা, চিনির পায়েস) 'খিরিস' (ক্ষীরের মিষ্টান্ন), 'খণ্ডশালুক' (নবাত বা তিলুয়া) ইত্যাদি এখন পর্যন্ত বাঙালীর রসনা তৃপ্ত করে আসছে। পাতলা দইকে বলত 'দ্রগড়'। অপ্রচলিত হয়ে গেছে 'শিখরিণী' (ঘি-দই-গুড়-আদা দিয়ে তৈরী), 'হাদুস' 'ভাদুস' বা 'ওলভ' (যবের বা ছোলার শীষ বা গাছ শুদ্ধ ঝলসানো) ও 'ভড়িত' (শিক-কাবাব) ইত্যাদি। চাটনির মত মুখচার ব্যঞ্জনের সাধারণ নাম ছিল 'ওড়শিআ'। যারা পিঠে ইত্যাদি তৈরী করত তাদিকে বলত 'ছন্দবার'।

প্রাকৃত-পৈঙ্গল নামে প্রাকৃত-ভাষার ছন্দোগ্রন্থে একটি শ্লোক আছে অপভ্রংশ ভাষায় লেখা। তাতে বাঙালীর একটি সনাতন প্রিয় ভোজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাচ্ছি। শ্লোকটি এই

ওগ গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধসজুত্তা
মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা(ই) পুনবন্তা ॥

[ওগরা ভাত, রম্ভার পাত, গাইয়ের ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত, মৌরলা মাছ, নালিতা শাক—কান্তা দিচ্ছে পুণ্যবান্ খাচ্ছে।]

'সিহল্লী' অর্থাৎ শুটকি মাছ নিম্নবঙ্গের দরিদ্র অধিবাসীদের খুব প্রিয় খাদ্য ছিল, এই কথা সর্বানন্দ বলে গেছেন—"যত্র বঙ্গালবচ্চারাণাং প্রীতিঃ"।

রাঁধাবার মাটির হাঁড়ির আকার অনুসারে নাম ছিল। যেমন, 'জাড়ি' (জালা), 'ভাণ্ডী' বা 'হাঁড়ি', 'তেলাবনী' (তেলানী) ইত্যাদি।

১১

সেকালের মেয়েদের বেশভূষার উল্লেখ সমসাময়িক সাহিত্য থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাজান্তঃপুরের মহিলারা সম্ভবত উত্তরাপথের মেয়েদের মতই বেশভূষা করতেন। রাজমহিষীরা সাধারণত আসতেন ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন রাজবংশ থেকে। আচার-ব্যবহারে কতকটা ঐক্য না থাকলে এরকম বৈবাহিক আদানপ্রদান সম্ভবপর হত না। সাধারণ ভদ্রমহিলারা এবং নিম্ন-সমাজের স্ত্রীলোকেরা একবস্ত্র পরে থাকত এবং মাথায় ঘোমটা দিত। লক্ষ্মীধরের একটি কবিতায় কুলমহিলার যে বর্ণনা আছে তা এখনো বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানের মধ্যবিত্ত ঘরের আদর্শ।

শিরো যদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং
গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দৃশৌ।
বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং
নিজং তদিয়মঙ্গনা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্॥

[ঘোমটা-ঘেরা মাথা স্বতই লজ্জাবনত, চলন ধীর, চোখ পায়ের দিকে নিবদ্ধ, বাক্য স্বল্প এবং মৃদুমধুর—এই দিয়ে যেন এই মহিলা উচ্চ স্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করছেন।]

বিবাহিত মেয়ের সীমন্তে সিঁদুর ধারণ তখনো প্রচলিত ছিল। গোবর্ধন-আচার্য লিখেছেন,

বন্ধনভাজোঽমুষ্যাঃ চিকুরকলাপস্য মুক্তমানস্য।
সিন্দূরিতসীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব ॥

[কবরীবন্ধনে মুক্ত-মান এই নারীর কেশপাশ যেন সঁাথির সিঁদুরের ছলে বিদীর্ণহৃদয় হয়েছে।]

অধরে অলক্তরাগ আর কবরীতে পুষ্পগুচ্ছ সেকালের তরুণীর বিলাসবেশের অঙ্গ ছিল,—সাঞ্চাধরের একটি শ্লোক থেকে একথা জানা যায়।

তখনকার মেয়েরা নীচের হাতে পরত শাঁখা, উপরের হাতে 'বাহুখড়', গলায় 'সাতসর' বা 'দেবচ্ছন্দ' হার, মাথায় 'হংসপদিকা', আর কানে সোনার 'তাড়ঙ্ক' অথবা কচি তালপাতার অবতংস 'তালীপত্র'। রাজপরিবার এবং রাজানুগৃহীত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কানে সোনার কুণ্ডল পরতে পেত না। রাজা খুশি হলে মেয়েদের সুবর্ণ কঙ্কণ এবং পুরুষদের সুবর্ণ কুণ্ডল পুরস্কার দিতেন। কচি তালপাতার মাকড়ি রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মেয়েরাও কানে দিত। দক্ষিণরাঢ়ের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ধোয়ী লিখেছেন,

গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
যত্র শ্রোত্রাভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি ॥

[যে-দেশের বিস্তীর্ণ অংশ গঙ্গাপ্রবাহের দ্বারা প্লাবিত হয়, যে-দেশ সৌধশ্রেণীর দ্বারা অলঙ্কৃত, সেই রসময় সুহ্মদেশ তোমার মনে বিশেষ বিস্ময় এনে দেবে। সে-দেশে নূতন চন্দ্রকলার মত কোমল তালীপত্র ব্রাহ্মণ-মহিলাদের কর্ণভূষণ হবার গৌরব পেয়ে থাকে।]

সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র 'মমল্ল' (মলমল) পরা মেয়েদের মধ্যেই চলত। সে-কাপড়ের সুতা তারা নিজেরা পাকাত। নির্ধন ব্রাহ্মণ-বাড়ীর মেয়েদেরও এই কাজ করতে হত। শুভাঙ্কের একটি রাজদান-প্রশংসা শ্লোকে পাই,

কার্পাসাস্থিপ্রচয়নিচিতা নির্ধনশ্রোত্রিয়াণাং
যেষাং বাত্যাপ্রবিততকুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভূবুঃ।
তৎসৌধানাং পরিসরভুবি ত্বৎপ্রসাদাদিদানীং
ক্রীড়াযুদ্ধচ্ছিন্নরযুবতীহারমুক্তাঃ পতন্তি ॥

[হে মহারাজ, যে-সব নির্ধন শ্রোত্রিয়ের ঝটিকা-বিহত কুটীরের উঠান কার্পাস বীজের দ্বারা আকীর্ণ ছিল, এখন তোমার প্রসাদে সেখানকার সৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্ন হারের মুক্তাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।]

শহরের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের নির্ধনত্ব ও সরলতা চিত্রিত করেছেন উমাপতিধর এই প্রশস্তি-শ্লোকে,

মুক্তাঃ কার্পাসবীজৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবূ-
পুষ্পৈ রূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমীনাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকশিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে ত্বৎপ্রসাদাদ্ বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্ ॥

[মহারাজ, তোমার প্রসাদে বহুবিভবশালী শ্রোত্রিয়-রমণীরা নগরবাসিনীদের কাছ থেকে মুক্তা কাপাস-বীজের মত, মরকত শাকপাতার মত, রূপা লাউফুলের মত, রত্ন পাকা ডালিমের বীজের মত, সোনা কুমড়া-লতার ফোটা ফুলের মত,—এইরূপ শিক্ষালাভ করে।]

এক অজ্ঞাতনামা কবি সমসাময়িক বঙ্গবিলাসিনীদের এইরকম বেশভূষার বর্ণনা দিয়ে গেছেন,

বাসং সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রী-
র্মালাগর্ভঃ সুরভিমসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনানাম্ ॥

[দেহে সূক্ষ্ম বসন, বাহুতে সোনার তাগা, মাথার উপরে গন্ধতৈল-সিক্ত কেশজাল মসৃণ করে আঁচড়ানো এবং চূড়ার মত খোঁপা বাঁধা, তাতে ফুলের মালা জড়ানো, কানে নূতন চন্দ্রলেখার মত নির্মল কচি তালপাতার দুল,—বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মন হরণ করে।]

বাংলা দেশে উৎপন্ন সূক্ষ্ম পাটের ও সূতার কাপড় উত্তরভারতের সর্বত্র আদরের সঙ্গে গৃহীত হত। চতুর্দশ শতাব্দীতে তীরভুক্তি-বাসী জ্যোতিরীশ্বর তাঁর বর্ণ-রত্নাকরে বাংলা দেশের 'মেঘ-উদুম্বর', 'গঙ্গাসাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'দ্বারবাসিনী', 'সিলহটী', 'গাঙ্গেরি' ইত্যাদি পট্ট ও নেত বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

সর্বানন্দের সময়েও "বিদগ্ধস্ত্রী"-রা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর গণিকারা অন্তর্বাস পরত 'চণ্ডাতক' বা জাঙ্ঘিয়া। 'উপলনী' ছিল অঙ্গরাগ লেপ। চোখে দিত কাজল। কপালে চন্দনের পত্রলেখা, তার মাঝে মাঝে 'কালিআ' অর্থাৎ হলদে রঙের ফোঁটা। নীচু করে চুল বাঁধলে হত 'খোপ্যক' অর্থাৎ খোঁপা, আর মাথার উপর উঁচু করে বাঁধলে হত, 'ঘোড়াচূড়' বা 'ঘোড়াচুলা'। চিরুণীর নাম 'কাঙ্ক' অর্থাৎ কাঁকুই। মেয়েরা চড়ত 'ঢল্লরিকা'-য় অর্থাৎ ডুলিতে কিংবা গোরুটানা বা ঘোড়াটানা 'কোল্লিয়ক'-এ। সাধারণ পালকির নাম ছিল 'ঝম্পান'। 'পেড়া' হত কাঠের, বাঁশের অথবা বেতের।

নগরবাসিনী বিলাসিনীর চালচলন পল্লী-অঞ্চলে নিন্দনীয় ছিল। গোবর্ধন-আচার্য এক শ্লোকে বলেছেন,

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম্।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি ॥

[সখি সোজা পা ফেলে চল, নাগরাচার সব ছাড়। কটাক্ষপাত করলেও এখানে গাঁয়ের মাতব্বর ডাইনী বলে দণ্ড দেয়।]

পল্লী-বিলাসিনীর বর্ণনা করেছেন চন্দ্রচন্দ্র এই শ্লোকে,

ভালে কজ্জলবিন্দুরিন্দুকিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুকেনিলফলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ।
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিষবণস্নিগ্ধঃ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যানাগরবধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ॥

[কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শাদা পদ্মডাঁটার বালা, ও তাগা, কানে কচি রীঠা ফলের দুল, কেশ স্নানস্নিগ্ধ এবং কবরীতে তিলপল্লব নিবদ্ধ,—পল্লীবধূবর্গের এই বেশ স্বতই পান্থদের গমন মন্থর করে দেয়।]

একদিকে বিলাসের এই ছবি অন্যদিকে দরিদ্র-গৃহিণীর বাস্তব-চিত্র। সে-কালের বিলাস-ব্যসনের ছটা কবে বিস্মৃতির অন্তরালে লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু বাংলা দেশের পল্লীনারীদের মধ্যে দারিদ্র্যের সনাতন রূপ এখনও অটুট রয়েছে। কবি যার লিখে গেছেন,

বৈরাগ্যৈকসমুন্নতা তনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণকুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্তুং সমভ্যর্থিতা।
দীনা দুঃস্থকুটুম্বিনী পরিগলদ্বাষ্পাম্বুধৌতাননা-
প্যেকং তণ্ডুলমানকং দিনশতং নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি॥

[নিরানন্দে তার দেহ সমুন্নত ও শীর্ণ, পরিধানে জার্ণ বস্ত্র। ক্ষুধায় চোখ ও পেট বসে গিয়েছে শিশুদের, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে। দীন দরিদ্র গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন এক মান তণ্ডুলে এক শ দিন চলে যায়।]

এক অজ্ঞাতনামা কবির আঁকা চিত্রও বড় মর্মান্তিক,

ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশব শবা ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবো
লিপ্তা জর্জরকর্করী জললবৈর্নো মাং তথা বাধতে।

গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপ্যন্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সূচীং যথা যাচিতা ॥

[শিশুরা ক্ষুধায় আকুল, দেহ শবের মত শীর্ণ, আত্মীয়স্বজন বিমুখ, পুরানো গাড়ুতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে,—এ সকল আমাকে তত কষ্ট দেয় নি যেমন কষ্ট দিয়েছিল গৃহিনীর যখন কাতর হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্য বারবার রুষ্ট প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সূচ চাইছিল তা দেখে।]

এখন যেমন তখনো তেমনি পুরুষেরা মাঠে খাটতে বেরিয়ে গেলে মেয়েরা গৃহকর্ম সেরে নিয়ে হাটে জিনিষ কেনাবেচা করতে যেত আর বেলা পড়ে এলে তাড়াতাড়ি করে ফিরত পাছে পুরুষরা আগে ঘরে ফিরে আসে। শরণের একটি শ্লোকে এই বর্ণনা পাচ্ছি,

এতাস্তা দিবাসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ
স্কন্ধপ্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরাঃ।
প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্য বর্ত্মচ্ছিদো
হট্টক্রয্যপদার্থমূল্যকলনব্যগ্রাঙ্গুলিগ্রন্থয়ঃ ॥

[এই চলেছে ধেয়ে মেয়েরা, তাদের চোখ সন্ধ্যাসূর্যের মত অরুণ, দ্রুত গমনের জন্য মাথার আঁচল বারবার খসে পড়ছে আর তা তুলে দেবার জন্য তাদের আগ্রহ, চাষী সকালে বেরিয়ে গেছে তার ফেরবার সময় হয়ে আসছে ভেবে যারা লাফিয়ে লাফিয়ে পথ সংক্ষেপ করছে, হাটে বেচাকেনার দাম যারা আঙ্গুলে গুণতে ব্যস্ত।]

বাংলা দেশে হেমন্ত ও শীত কাল ফসল তোলবার সময়। এক অজ্ঞাতনামা কবি সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বেকার শীতকালের বাংলা-পল্লীর সমৃদ্ধির সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন,

শালিচ্ছেদসমৃদ্ধহালিকগৃহাঃ সংস্পৃষ্টনীলোৎপল-
স্নিগ্ধশ্যামযবপ্ররোহনিবিড়ব্যাদীর্ঘসীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্তধেন্বনডুহশ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্তধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ ॥

[চাষীদের গৃহে ধান্যস্তূপ ঐশ্বর্য জ্ঞাপন করছে, নীলোৎপলের সংযোগে নবপ্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রের সীমাকে দীর্ঘায়ত করেছে, গোরু ষাঁড় ছাগল ঘরে ফিরে এসে নতুন খড় খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে; গ্রাম সব হয়েছে আখমাড়াই কলের শব্দে মুখর আর নূতন গুড়ের গন্ধে আকুল।]

সেকালের পল্লীবাসী কৃষিজীবী বাঙালী ভদ্রলোকের সাংসারিক জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ ব'লে গেছেন কবি শুভাঙ্ক,

বিষয়পতিরলুব্ধো ধেনুভির্ধাম পূতং
কতিচিদভিমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি।
শিথিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী সপর্যাম্
ইতি সুকৃতমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন ॥

[প্রাদেশিক শাসনকর্তা লোভহীন, ধেনুর দ্বারা গৃহ পবিত্র, অভিমত ক্ষেত্রসীমার মধ্যে চাষ চলে, অতিথিবৎসল গৃহিণী পরিচর্য্যায় ক্লান্ত হন না,—এই ফলের দ্বারা এর পুণ্য অভিব্যক্ত হয়েছে আমাদের কাছে।]

জীবনের এই সহজ সরল শান্ত আদর্শ আমাদের মন এখনো টানে যদিও আমরা এর থেকে এখন অনেক দূরে সরে এসেছি।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ